1 ভূমিকা
(Introduction)

1.1. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা (Definition of Economic Development) :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকে একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে প্রকাশ করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে অধ্যাপক Meier এবং Baldwin অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অনেকখানি সন্তোষজনক। সংজ্ঞাটি বেশ সহজ ও সরল। অধ্যাপক Meier এবং Baldwin-এর মতে, **অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায়** (Economic development is a process through which the per capita real national income of a country increases over a long period of time)। এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে **অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য** দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথমত, এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হ'ল একটি প্রক্রিয়া। এর অর্থ হ'ল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। বিভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তি একে অপরের সহিত নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা নানা ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে। এই বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা ঘাত-প্রতিঘাতকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া বলা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে শক্তিগুলি কাজ করে, তাদের ঘাত-প্রতিঘাত বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে ফলশ্রুতি ঘটে সেটি হল মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। আমরা জানি যে, কোনো দেশের প্রকৃত আয়কে সেই দেশের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে গেলে এই মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়তে হবে। এখন, মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়তে হলে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হতে হবে। জাতীয় আয় যদি জনসংখ্যা অপেক্ষা কম হারে বাড়ে বা জাতীয় আয় যদি জনসংখ্যার সঙ্গে সমান হারে বাড়ে তাহলে মাথাপিছু আয় কমবে অথবা একই থাকবে। তখন তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হওয়া প্রয়োজন। তবেই মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়া প্রয়োজন। যদি উৎপাদনের পরিমাণ একই থাকে এবং শুধুমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বাড়তে থাকে তাহলে টাকার অঙ্কে মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে, কিন্তু মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়ছে না। তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়া প্রয়োজন। আর সেজন্য প্রয়োজন দেশের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন।

চতুর্থত, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ঘটলে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে। বাণিজ্য চক্রের ফলে স্বল্পকালে মাথাপিছু আয় বাড়তে বা কমতে পারে। এখন, যদি দেখা যায় যে, স্বল্পকালে মাথাপিছু আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলেও দীর্ঘকালে মাথাপিছু আয় গড়ের উপর বেড়েছে বা দীর্ঘকালে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির একটি প্রবণতা বা গতিধারা (trend) রয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, স্বল্পকালে আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটছে, কিন্তু দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির কোন প্রবণতা বা গতিধারা লক্ষ করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে না বলেই ধরতে হবে। আর একটি কারণেও মাথাপিছু আয়ের দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি প্রয়োজন। আমরা আগেই বলেছি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মাথাপিছু প্রকৃত আয় দীর্ঘকালব্যাপী

বৃদ্ধি পায়। এখন, মাথাপিছু প্রকৃত আয়কে যদি দীর্ঘকালব্যাপী বাড়তে হয় তাহলে উন্নয়নের প্রক্রিয়াকেও একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া হতে হবে। দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার মধ্যে দেশের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ নতুন দ্রব্যের আবিষ্কার, মূলধন গঠন, কৃৎকৌশলের উন্নতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সামাজিক সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন, জনসাধারণের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার, সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ প্রভৃতি। এই বিষয়গুলির পরিবর্তন দীর্ঘকালেই সম্ভব। আর এই সমস্ত পরিবর্তনই একাধারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণ ও ফল।

অবশ্য মায়ার ও বলড্উইনের সংজ্ঞার মধ্যেও কিছুটা অসম্পূর্ণতা আছে। **প্রথমত,** এই সংজ্ঞায় জনসাধারণের আয় বণ্টনের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমরা জানি যে, মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব মাত্র। যদি দেশের কেবলমাত্র ধনীদের আয় বাড়ে এবং গরীবদের আয় কমে বা স্থির থাকে বা কম হারে বাড়ে, তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু পাশাপাশি আয়বণ্টনের বৈষম্যও বাড়বে। সেক্ষেত্রে দেশের ব্যাপক জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়বে না। সুতরাং, যদি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বণ্টনের বৈষম্য কমে তবেই তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে। **দ্বিতীয়ত,** মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের কাঠামোগত পরিবর্তনও ঘটতে হবে। এর অর্থ হল, জাতীয় আয়ের বেশি অংশ মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্র থেকে আসতে হবে এবং জনসংখ্যার বেশি অংশ এই দুই ক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে হবে। যদি মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়ে কিন্তু দেশের উৎপাদন কাঠামো (output structure) এবং পেশাগত কাঠামোর (occupation structure) কোন পরিবর্তন না ঘটে, তবে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে কিনা, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এ সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং যার ফলে মোট এবং আনুপাতিক হিসাবে দেশের দরিদ্র জনসংখ্যা কমে এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে।**

1.2. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক (Indicators of Economic Development) :

আমরা বলেছি যে, সাধারণভাবে **অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে।** এই সংজ্ঞা থেকে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পেতে পারি। **প্রথমত,** অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। **দ্বিতীয়ত,** মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা হবে। এর অর্থ হল, প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হতে হবে। **তৃতীয়ত,** 'প্রকৃত' আয় বৃদ্ধি ঘটতে হবে, 'আর্থিক' আয় নয়। **চতুর্থত,** মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে হতে হবে। **পঞ্চমত,** মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটতে হবে।

যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে কিনা তা দেখার জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেড়েছে কিনা তা দেখা হয়, তাই মাথাপিছু আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে, মাথাপিছু প্রকৃত আয় হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় সূচক। কিন্তু এই সূচকেরও নানা সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্য অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচক নির্দেশ করেছেন। সাধারণভাবে, **অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলত চারটি সূচকের কথা বলা হয়। এই চারটি সূচক হ'ল : মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার বাস্তব মানের সূচক, মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানব উন্নয়ন সূচক।** আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই **চারটি সূচক** নিয়ে একে একে আলোচনা করবো।

A. মাথাপিছু আয় (Per Capita Income) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় নির্দেশক হল মাথাপিছু প্রকৃত আয়। অন্যান্য বিষয় সমান বা

অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায়, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর উচ্চ এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর নিম্ন বলে ধরা যেতে পারে।

এখন, মাথাপিছু প্রকৃত আয় $= \frac{\text{মোট প্রকৃত জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$ ।

প্রতীকের সাহায্যে লিখতে গেলে, $y = \frac{Y}{P}$. এখন, মাথাপিছু প্রকৃত আয় (y) বাড়তে পারে যদি মোট জাতীয় আয় (Y) দেশের মোট জনসংখ্যা (P) অপেক্ষা বেশি হারে বাড়ে। এটি খুব সহজেই দেখানো যায়। $y = \frac{Y}{P}$ এই সমীকরণের উভয় পক্ষে log নিয়ে পাই, $\log y = \log Y - \log P$. উভয়পক্ষকে সময়ের (t) সাপেক্ষে অবকলন করে পাই, $\frac{1}{y}\frac{dy}{dt} = \frac{1}{Y}\frac{dY}{dt} - \frac{1}{P}\frac{dP}{dt}$

অর্থাৎ মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার = প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার – জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। সুতরাং, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার ধনাত্মক হতে গেলে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হতে হবে। সেক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বাড়বে। সুতরাং, মাথাপিছু আয় সূচক অনুযায়ী, যদি কোনো দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে ঐ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে।

আমরা আগেই বলেছি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সূচক সবচেয়ে জনপ্রিয়। কয়েকটি কারণে এই সূচককে পছন্দ করা হয়। **প্রথমত**, মাথাপিছু আয় ক্রমবর্ধমান হলে মোটের উপর বলা যেতে পারে যে, দেশটির উন্নতি ঘটছে। একথা অনস্বীকার্য যে, মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব মাত্র। কিন্তু এই গড় ক্রমাগত বাড়লে তা নির্দেশ করে যে, মাথাপিছু দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের প্রাপ্তি বাড়ছে। **দ্বিতীয়ত**, অনুন্নত দেশে উন্নয়ন পরিমাপ করতে হলে মাথাপিছু আয় সূচক সবচেয়ে উপযোগী। কেননা এই সূচকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে বিবেচনা না করলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো অর্থ হয় না। **তৃতীয়ত**, বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর তুলনা করতে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের কৃতিত্ব তুলনা করতে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সূচক বিশেষ উপযোগী। যে দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় যত বেশি, সেই দেশ তত উন্নত বলে ধরা যেতে পারে।

এখন, মাথাপিছু 'প্রকৃত' জাতীয় আয় বাড়লে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায়—'আর্থিক' আয় নয়। যদি উৎপাদনের পরিমাণ একই থাকে এবং শুধুমাত্র দামস্তর বাড়ে, তাহলে আর্থিক আয় বাড়বে, প্রকৃত মাথাপিছু আয় বাড়বে না। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা যাবে না। সেজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। আবার, যদি প্রকৃত জাতীয় আয় কমে এবং জনসংখ্যা যদি বেশি হারে কমে, তাহলে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়বে। কিন্তু তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। সুতরাং মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লেই দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে তা বলা যায় না। এজন্য কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ (যেমন, কুজনেৎস্) মোট প্রকৃত জাতীয় আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে ব্যবহার করার সুপারিশ করেছেন।

কিন্তু প্রকৃত জাতীয় আয়কে উন্নয়নের সূচক হিসাবে ধরলে অনেক উদ্ভট সিদ্ধান্ত (odd conclusions) বেরিয়ে আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের প্রকৃত জাতীয় আয় সুইডেনের জাতীয় আয় অপেক্ষা বেশি হতে পারে। তাহলে ভারতকে সুইডেন অপেক্ষা উন্নততর বলতে হয়। কিন্তু মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দেখলে আমরা বলতে পারি যে, সুইডেন ভারত অপেক্ষা বেশি উন্নত কারণ সুইডেনের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ভারতের চেয়ে বেশি এবং সুইডেনের জীবনযাত্রার মান উন্নততর। আবার, কোনো দরিদ্র দেশে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধনী দেশ অপেক্ষা বেশি হতে পারে। দরিদ্র দেশের প্রাথমিক মোট আয় কম হওয়ার দরুন এটা হতে পারে। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয়কে বা জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে উন্নয়নের সূচক বলে ধরলে আমাদের

দরিদ্র দেশটিকে উন্নততর বলতে হয়। সেটি ভুল সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার আমাদের সঠিক চিত্র দিতে পারে। তাই জাতীয় আয় অপেক্ষা মাথাপিছু আয়ই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভালো সূচক।

অবশ্য মাথাপিছু আয় সূচকেরও কতকগুলো অসুবিধা আছে। **প্রথমত,** মাথাপিছু আয় গড় হিসাব মাত্র। আমরা আগেই বলেছি যে, জাতীয় আয় না বেড়ে জনসংখ্যা হ্রাস পেলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা চলে না। **দ্বিতীয়ত,** মাথাপিছু আয়ের হিসাবে আয়বণ্টনকে ধরা হয় না। যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের আয় কমে এবং অল্প কয়েকজনের আয় বাড়ে, তাহলেও মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। কিন্তু তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তা বলা যাবে না। **তৃতীয়ত,** মাথাপিছু আয় বাড়লেই জীবনযাত্রার মান বাড়ে একথা সর্বদা সত্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোর মাথাপিছু আয় আমেরিকার সমতুল্য বা তার থেকেও বেশি। কিন্তু ঐ দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে আমেরিকার ন্যায় উন্নত নয়। **চতুর্থত,** যদি মাথাপিছু আয় একই থাকে, তাহলেও দরিদ্র জনসাধারণকে জীবনধারণের মৌল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যোগান দিলে জীবনযাত্রার মান বাড়ে। যেমন, জনস্বাস্থ্য পরিসেবা, নিরাপদ পানীয় জল প্রভৃতির যোগান বাড়লে জীবনযাত্রার মান বাড়ে। **পঞ্চমত,** যদি জাতীয় আয় বাড়ে এবং যদি জনসংখ্যা স্থির থাকে অথবা আয় অপেক্ষা কম হারে বাড়ে, তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু, ধরা যাক, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি পাওয়া গেছে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে অথবা পুনর্নবীকরণযোগ্য নয় এমন সম্পদ ব্যবহার করে। তাছাড়া, জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষণ বেড়েছে অথবা কোন শিল্পসংশ্লিষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এমন হতে পারে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বাড়লেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বা জীবনযাত্রার মান বেড়েছে তা বলা যায় না।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু আয়ের এসমস্ত নানা অসুবিধা থাকার জন্য অর্থনীতিবিদগণ উন্নয়ন পরিমাপের জন্য বিকল্প সূচকের কথা বলেছেন। এরূপ একটি বিকল্প সূচক হ'ল জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক। আমরা এখন এই সূচকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

(B) জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক বা PQLI (Physical Quality of Life Index) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেও এই সূচকের কিছু ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্য বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য কিছু বিকল্প সূচকের কথা বলেছেন। তাঁরা কিছু সামাজিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধরনের সূচককে সামাজিক সূচক (social indicators) বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই শ্রেণিতে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলত তিনটি সূচক রয়েছে, যথা, জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক (Physical Quality of Life Index) বা সংক্ষেপে PQLI, মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি (Basic Needs Approach) এবং মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) বা সংক্ষেপে HDI.

জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক বা PQLI গঠন করেন Morris D. Morris এবং আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ। তাঁদের যুক্তি হল, উন্নয়নে আয় সূচক শুধুমাত্র দ্রব্য ও সেবাকার্যের পরিমাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং জীবনযাত্রার গুণগত মানকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করে। অথচ উন্নয়নের কাজই হল এই জীবনযাত্রার মানের উৎকর্ষ বাড়ানো। এজন্যই তাঁরা জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক গঠন করেন। এটি একটি যৌথ (composite) সূচক। এই সূচকের মূলকথা হ'ল, শুধু জাতীয় বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেই হল না, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হওয়া দরকার। এই জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি বিভিন্ন সূচকের দ্বারা পরিমাপ করা যায়। মরিস তিনটি সূচকের উল্লেখ বা ব্যবহার করেছেন। সেগুলো হ'ল : গড় আয়ু প্রত্যাশা বৃদ্ধি, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। Morris এই তিনটি সূচকের সরল যৌগিক গড় নিয়ে জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক বা PQLI গঠন করেছেন।

মরিসের এই সূচকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য উন্নয়নের ফলে জীবনযাত্রার মান কীরূপ

বেড়েছে তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাস্তবিকই, সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান না বাড়লে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথাটি অর্থহীন। তবে মরিসের PQLI-এরও কিছু **সীমাবদ্ধতা** আছে। **প্রথমত**, জীবনযাত্রার মান বেড়েছে কিনা তা পরিমাপ করার জন্য মরিস তিনটি সূচকের সরল গড় ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত বিষয়গুলো হল গড় আয়ু প্রত্যাশা, শিশুমৃত্যুর হার ও সাক্ষরতার হার, কিন্তু জীবনযাত্রার মান পরিমাপের জন্য আরও অনেক বিবেচনা করা যেতে পারে যেগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, Hagen এবং United Nations পৃথকভাবে আরও কিছু বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে জীবনযাত্রার মান বেড়েছে কিনা তা বিচার করতে বলেছেন। সেই বিষয়গুলি হল খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে মরিসের PQLI সূচকটি অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট বলে ভাবা যেতে পারে। **দ্বিতীয়ত**, মরিসের PQLI গঠন করতে তিনটি উপসূচক বা উপাদান-সূচকের (component index or sub-index) 'সরল' গড় ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হ'ল জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে ঐ তিনটি উপ-সূচক বা উপাদান সূচকের গুরুত্ব সমান ধরা হয়েছে। এটিও বিতর্কের ব্যাপার। জীবনধারণের মান নির্ধারণে ঐ তিনটি বিষয় সমান গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে উপ-সূচকগুলির গুরুত্বশীল গড় (weighted average) বের করে সূচকটি নির্ণয় করা দরকার। কিন্তু সেখানেও বিভিন্ন উপ-সূচককে কীরূপ গুরুত্ব দেওয়া হবে তা নিয়ে মতভেদ বা বিতর্ক থাকতে পারে। **তৃতীয়ত**, জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনা করা দরকার সে সম্পর্কে কোনো বস্তুনিষ্ঠ নিয়ম নেই। এই বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তি ব্যক্তির নিজস্ব বিচার-বিবেচনার (value judgements) উপর নির্ভর করে। সুতরাং, PQLI-এর গঠন অনেকখানিই মনোগত বা মনস্তাত্ত্বিক (subjective)।

এ সমস্ত সমস্যার জন্য এবং আলোচনা সরল রাখার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ধারণা ব্যবহার করার পক্ষপাতী।

(C) মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি (Basic Needs Approach) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের তৃতীয় নির্দেশক বা সূচক হল মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি। এই পদ্ধতিতে জনসাধারণের কাছে বিশেষত গরিবদের কাছে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল দ্রব্যসামগ্রীর যোগান কতটা বেড়েছে তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করা হয়। এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন Paul Streeten, Norman Hicks, Shahid Javed Burki এবং আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের মধ্যে রয়েছে খাদ্য, বাসস্থান, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। স্বল্পোন্নত দেশের গরীবদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এই তালিকায় মোটামুটি সঠিকভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জীবনযাত্রার মান পরিমাপের এই দৃষ্টিভঙ্গি সরাসরি অনুন্নত দেশের দরিদ্রদের অবস্থার প্রতি আলোকপাত করেছে। এই পদ্ধতিতে আয়বৃদ্ধিকে অবহেলা করা হয়, তা নয়। মোট উৎপাদন বৃদ্ধি বা তার বণ্টনকে অবহেলা করা হয় না। তবে বর্ধিত উৎপাদন গরিবেরা পাচ্ছে কিনা এবং বর্ধিত উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে গরিবদের প্রয়োজনীয় ও গরিবদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রী আছে কিনা তা এই পদ্ধতিতে দেখা হয়। এই পদ্ধতির মতে, জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হলে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর সমন্বয় (product-mix) এমন হতে হবে যাতে দরিদ্র শ্রেণির মৌল প্রয়োজনটুকু মেটে এবং শ্রমিক নিয়োগ যেন সর্বাধিক হয়। কেননা তাহলে আয়ের বণ্টন অনেকটা সুষম হবে। আর উন্নয়নের সুবিধা কারা ভোগ করবে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণির সুবিধার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য হ'ল, সরকারকে গরিবদের মৌল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সরবরাহ করতে প্রণোদিত করা। উন্নয়নের সুফল যেন দরিদ্র শ্রেণির কাছে গিয়ে পৌঁছায় এবং তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে। সর্বনিম্ন বা একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো তারা যেন পায়, সেটা নিশ্চিত করাই এই দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে দেখলে এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত মানবিক। তাছাড়া, উন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দেশের সাফল্য তুলনা করার ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার, কোনো স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের দিকনির্দেশ করতে এবং উন্নয়নের বিভিন্ন নীতি বা পন্থার যৌক্তিকতা বিচার করতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি সহায়ক হতে পারে।

তবে মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গিরও কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। PQLI-এর ক্ষেত্রে যে সকল সমালোচনা করা হয়, একই সমালোচনা এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো কী কী, সে সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে। আবার, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্ব কী হবে, তা নিয়েও মতভেদ থাকবে। যেহেতু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ভর করে ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণার (value judgements) উপর, এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতৈক্য না হওয়াই স্বাভাবিক।

তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দরিদ্রদের মৌল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরাসরি যোগান দিয়ে দারিদ্র্য দূর করতে চায়। অবশ্য মৌল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান দিতে গিয়ে কোন দেশের সরকার যেন ঐ দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিষয়টি অবহেলা না করে। তাহলে কিন্তু দীর্ঘকালে মৌল প্রয়োজনটুকু যোগান দেওয়া সরকারের কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। এদিক থেকে দেখতে গেলে, মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের যে আয়-সূচক রয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং তা আয়-সূচকের পরিপূরক।.

(D) মানব উন্নয়ন সূচক বা HDI (Human Development Index) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ সামাজিক নির্দেশক হ'ল মানব উন্নয়ন সূচক বা সংক্ষেপে, HDI. 1990 সাল থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য মানব উন্নয়ন সূচক ব্যবহার করা হচ্ছে। পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ Mahbub-ul Haq-এর দক্ষ নেতৃত্বে এই সূচক গঠন করা হয়। বেশ কিছুদিন ধরেই কিছু অর্থনীতিবিদ যেমন, Hagen, Adelman, Harbison, Morris, Hicks, Streeten এবং Burki প্রমুখ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকল্প কোনো সূচক সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপক হিসাবে আয়-সূচক সম্পর্কে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই আয়-সূচকের উন্নততর কোনো বিকল্প সূচক কীভাবে পাওয়া যেতে পারে, সেই চিন্তায় তাঁরা ব্যাপৃত ছিলেন। অধ্যাপক Morris D. Morris জীবনধারণের বাস্তব মান সূচকের (সংক্ষেপে PQLI) ধারণার রূপ দেন। অন্যদিকে, Streeten, Hicks এবং Burki উন্নয়ন পরিমাপের জন্য মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গির (Basic Needs Approach) ধারণা পরিপুষ্ট করেন। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের এই সমস্ত প্রচেষ্টা এবং একজাতীয় লেখনীর ফলশ্রুতি রূপেই মানব উন্নয়ন সূচকের (Human Development Index) বা HDI-এর উদ্ভব ঘটে।

মানব উন্নয়ন সূচকে মানব উন্নয়ন বলতে মানুষের নির্বাচনের সুযোগ বা সীমা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বোঝানো হয়েছে (human development as the process of enlarging people's choices)। যে বিষয়গুলোর নির্বাচন মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো হল ঃ দীর্ঘ ও নীরোগ জীবনযাপন, শিক্ষিত হওয়া বা শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া এবং জীবনযাত্রার একটা সন্তোষজনক মান ভোগ করা। এই তিনটি বিষয় যথাক্রমে তিনটি নির্দেশক বা সূচকের দ্বারা মাপা যেতে পারে, যথা, আয়ু-দৈর্ঘ্য (longevity), শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন (educational attainment) এবং জীবনযাত্রার মান। মানব উন্নয়ন সূচক হল এই তিনটি সূচকের সংযুত বা যৌথ (composite) সূচক। এখানে আয়ু-দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় জন্মের সময় আয়ু প্রত্যাশার (life expectancy at birth) দ্বারা। শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন পরিমাপ করা হয় দুটি বিষয়ের দ্বারা ঃ প্রাপ্তবয়স্কের সাক্ষরতা (দুই-তৃতীয়াংশ গুরুত্ব) এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং শেষ স্তরে শিক্ষালাভের বছর সংখ্যা (এক-তৃতীয়াংশ গুরুত্ব)। আর জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করা হয় মাথাপিছু স্থূল অন্তর্দেশীয় আয়ের (GDP) দ্বারা। এখানে আয় পরিমাপ করা হয় ডলারের অঙ্কে ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে (in terms of dollar as per purchasing power parity বা, সংক্ষেপে, PPP $)। মানব উন্নয়ন সূচক হল এই তিনটি সূচকের সরল যৌগিক গড়। অর্থাৎ HDI হল আয়ু-প্রত্যাশা সূচক, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক এবং মাথাপিছু প্রকৃত অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন সূচকের সরল যৌগিক গড়। এই HDI বা মানব উন্নয়ন

সূচকের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে বিরাজ করে। যে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে এই সূচকের মান 0.5-এর কম, সেই সমস্ত দেশ মানব উন্নয়নের নিম্নস্তরে রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই সূচকের মান 0.5 হতে 0.8-এর মধ্যে হলে মানব উন্নয়ন মধ্যম স্তরে এবং সূচকের মান 0.8-এর বেশি হলে মানব উন্নয়ন উচ্চতর স্তরে ঘটেছে বলে ধরা হয়।

2001 সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে রাষ্ট্রসঙ্ঘ 162 টি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের HDI-এর মান এবং সেই অনুযায়ী তাদের ক্রম প্রকাশ করেছে। আমরা আমাদের সারণিতে নির্বাচিত কিছু দেশের মানব উন্নয়ন সূচক ও তাদের অবস্থান দেখিয়েছি। 2001 সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 162 দেশের মধ্যে 48 টি দেশ উচ্চ মানব উন্নয়ন শ্রেণিতে রয়েছে। এই শ্রেণিতে রয়েছে নরওয়ে, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং যুক্তরাজ্যের ন্যায় উন্নত দেশ, আবার, সাইপ্রাস, বারবাডোজ, আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়ের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশ। মানব উন্নয়নের দিক হতে মধ্যম শ্রেণিতে রয়েছে 78 টি দেশ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মেক্সিকো, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা, চিন, ভারত প্রভৃতি। মানব উন্নয়নের খুব নিম্ন স্তরে আছে এমন দেশ ঐ তালিকায় রয়েছে 36টি। এই শ্রেণিভুক্ত দেশগুলো হল পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল,

নির্বাচিত কিছু দেশের HDI-এর মান ও অবস্থান, 1999

দেশ	HDI-এর মান	HDI-ভিত্তিক স্থান বা ক্রম	মাথাপিছু প্রকৃত GDP (PPP$), 1999	মাথাপিছু প্রকৃত GDP(PPP$) ভিত্তিক স্থান বা ক্রম	মাথাপিছু GDP ভিত্তিক ক্রম এবং HDI-ভিত্তিক ক্রমের পার্থক্য*
উচ্চ মানব উন্নয়নের দেশ					
নরওয়ে	0.939	1	28,433	3	2
কানাডা	0.936	3	26,251	6	3
U.S.A.	0.934	6	31,872	2	– 4
জাপান	0.928	9	24,898	11	2
যুক্তরাজ্য	0.923	14	22,093	19	5
মধ্য মানব উন্নয়নের দেশ					
মেক্সিকো	0.790	51	8,297	51	0
মালয়েশিয়া	0.774	56	8,209	52	– 4
ব্রাজিল	0.750	69	7,037	57	–12
শ্রীলঙ্কা	0.735	81	3,279	100	19
চিন	0.718	87	3,617	94	7
ভারত	0.571	115	2,248	115	0
নিম্ন মানব উন্নয়নের দেশ					
বাংলাদেশ	0.470	132	1,483	128	– 4
ইথিওপিয়া	0.321	158	628	158	0

[* ধনাত্মক মান নির্দেশ করছে যে, দেশটির HDI ভিত্তিক ক্রম বা অবস্থান দেশটির মাথাপিছু GDP-ভিত্তিক ক্রম অপেক্ষা ভালো। এর অর্থ হল দেশটি তার উন্নয়নের সুফল দেশবাসীর কল্যাণে ব্যবহার করেছে। তেমনি ঋণাত্মক মান বিপরীত বিষয় নির্দেশ করছে।]

সূত্র ঃ ইউ. এন. ডি. পি., মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, 2001.

জাম্বিয়া, ইথিওপিয়া প্রভৃতি। ভারতের ক্ষেত্রে HDI-এর মান হল 0.571 এবং তার স্থান 162 টি দেশের মধ্যে 115-তম। মানব উন্নয়নের দিক হতে ভারতের চেয়ে চিন এমনকি শ্রীলঙ্কাও এগিয়ে আছে। চিনের HDI-এর মান হল 0.718 এবং এর স্থান 87-তম। আর শ্রীলঙ্কার মানব উন্নয়নসূচক হ'ল 0.735 এবং এর অবস্থান হল 81-তম।

আমরা একটি সারণিতে কিছু দেশের 1999 সালের HDI-এর মান এবং তার ভিত্তিতে ঐ দেশগুলোর অবস্থান দেখিয়েছি।

আমরা দেখছি যে, মানব উন্নয়ন রিপোর্টে (Human Development Report) রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়ন সূচক নির্ণয় করেছে। সেই মান অনুযায়ী দেশগুলোর আপেক্ষিক অবস্থানও (HDI Rank) নির্ণয় করা হয়েছে। আবার, মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতেও দেশগুলোর আপেক্ষিক অবস্থান দেখানো হয়েছে। এভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়ন সূচক ও আয়-সূচকের ভিত্তিতে তাদের অবস্থানের তালিকা প্রস্তুত করেছে। সেই সমস্ত তালিকা বা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক দেশের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে তুলনামূলক অবস্থান এবং মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে তুলনামূলক অবস্থান ভিন্নরূপ। যে সমস্ত দেশের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অবস্থানের তুলনায় মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে অবস্থান উচ্চতর, সেই সমস্ত দেশ তাদের উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি ছড়িয়ে দিতে পেরেছে বলে ধরা যেতে পারে। আবার, যে সমস্ত দেশের অবস্থান মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে উপরে, কিন্তু মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত নীচে, সেই দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সমাজের দুর্বল শ্রেণির নিকট ততটা পৌঁছে দিতে পারে নি বলে মনে করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মানব উন্নয়ন সূচক নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এই সূচকে মানব উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যা সাধারণ মানুষের কল্যাণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে রেখেছে। মাথাপিছু আয়ের নিছক বৃদ্ধি মানব উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। মানব উন্নয়নের মূলকথা হল মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নির্বাচনের সুযোগ বা ক্ষমতা বাড়া (a process of enlarging people's choices)। মাথাপিছু আয় বা অর্থনৈতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের (economic well-being) বাইরেও মানুষের কিছু চাওয়ার থাকতে পারে। জ্ঞান, সুস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশ, রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের নানা খুঁটিনাটি আনন্দ ও সুখ আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে না। নিছক সম্পদ নয়, সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারই মানুষের উন্নয়ন নির্ধারণ করে। Mahbub-ul Haq সঠিকভাবেই আমাদের সতর্কবাণী শুনিয়েছেন—"Unless societies recognise that their real wealth is their people, an excessive obsession with creating material wealth can obscure the goal of enriching human life". তিনি বলেছেন যে, আমাদের ভুললে চলবে না, মানুষই সমাজের প্রকৃত সম্পদ। তা না হলে শুধু বস্তুগত সম্পদ তৈরির অতিরিক্ত নেশা আমাদের মানব জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে তোলার মহতী লক্ষ্যকে ঢেকে দেবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে সেই প্রচলিত ভ্রান্তি কাটানোর অভিমুখে HDI হল সঠিক এবং সদর্থক পদক্ষেপ।

অবশ্য HDI ধারণারও কয়েকটি **সীমাবদ্ধতা** আছে। **প্রথমত**, HDI গঠন করার জন্য যে তিনটি নির্দেশক বা উপ-সূচক ব্যবহার করা হয় সেগুলোই মানব উন্নয়নের একমাত্র নির্দেশক নয়। আরও অনেক বিষয়ই মানব উন্নয়নের মাত্রা বা স্তর নির্ধারণ করে, যেমন, শিশু মৃত্যুর হার, শিশু ও বৃদ্ধদের পুষ্টির স্তর প্রভৃতি। **দ্বিতীয়ত**, মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) গঠন করার সময় এর উপ-সূচকগুলিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু মানব উন্নয়ন নির্ধারণে এই উপ-সূচকগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। তাছাড়া, এই গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বস্তুনিষ্ঠ নিয়ম অনুসরণ করা হয় নি। গুরুত্ব দেওয়ায় সমগ্র প্রক্রিয়াটি একান্তভাবে মানসিক (subjective)। **তৃতীয়ত**, অধ্যাপক Todaro মনে করেন যে, মাথাপিছু আয় ও তার সঙ্গে কিছু সামাজিক নির্দেশক যোগ করে উন্নয়ন পরিমাপ করা মানব উন্নয়ন সূচক অপেক্ষা উন্নততর পদ্ধতি। এ মতটি অবশ্য তর্কসাপেক্ষ।

এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু আয় অপেক্ষা মানব উন্নয়ক সূচক অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। মানব উন্নয়ন সূচক নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের (economic well-being) উপর জোর দেয়নি, এটি মানুষের সার্বিক উন্নয়নের

উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই সূচক কেবলমাত্র উন্নয়নের উপায় বা মাধ্যমের উপর জোর দেয়নি, উন্নয়নের শেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছে। এখানেই সূচকটির উৎকর্ষ ও স্বকীয়তা।

☐ মানব উন্নয়ন সূচক গঠন করার পদ্ধতি ঃ একটি উদাহরণ (Method of Construction of Human Development Index : An Example)

আমরা জানি যে, মানব উন্নয়ন সূচক হল তিনটি উপ-সূচকের সরল যৌগিক গড়। এই তিনটি উপ-সূচক হল প্রত্যাশিত আয়ু সূচক (Life Expectancy Index), শিক্ষা সূচক (Education Index) এবং স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক (Gross Domestic Product Index)। এই তিনটি উপ-সূচক কীভাবে গঠন করা যায় তা দেখা যাক।

এই তিনটি উপ-সূচকের প্রতিটি গঠন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই মানগুলি নিম্নরূপ ঃ

নির্দেশকসমূহ (Indicators)	**সর্বনিম্ন মান** (Minimum value)	**সর্বোচ্চ মান** (Maximum value)
জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু	25 বছর	85 বছর
প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার	0%	100%
সম্মিলিত ভর্তির হার	0%	100%
মাথাপিছু স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (মার্কিন ডলারে আন্তর্জাতিক ক্রয় ক্ষমতার সমতার নিরিখে)	$100	$40,000

HDI-এর কোন উপসূচকের মান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট নির্দেশকের মান নিম্নলিখিত সূত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

$$\text{উপ-সূচক} = \frac{\text{প্রকৃত মান} - \text{সর্বনিম্ন মান}}{\text{সর্বোচ্চ মান} - \text{সর্বনিম্ন মান}}$$

উদাহরণস্বরূপ, কোন দেশে যদি জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু 55 বছর হয় তাহলে ঐ দেশের প্রত্যাশিত

$$\text{আয়ু সূচক} = \frac{55-25}{85-25} = \frac{30}{60} = 0.50$$

এই সূচক থেকে জানা যাবে সম্ভাব্য সর্বাধিক সাফল্যের কতটা সংশ্লিষ্ট দেশটি অর্জন করতে পেরেছে।

আয় সূচক গঠন করার পদ্ধতিটি অবশ্য কিছুটা ভিন্ন এবং জটিল। 1994 সালে বিশ্বের গড় আয় ছিল 5835 ডলার (PPP $)। এই আয়স্তরকে ভিত্তি আয়স্তর (threshold level) ধরে এই স্তরের চেয়ে বাড়তি আয়কে Atkinson-এর সূত্র প্রয়োগ করে বাট্টা করা হয়েছে। এর যুক্তি হল, ঐ নির্ধারিত সীমার (threshold level) উপরে আয়স্তর যত বেশি হবে, সেই অতিরিক্ত আয়স্তরের উপযোগিতা ক্রমাগত কম হবে। Atkinson-এর সূত্র প্রয়োগ করে $40,000 (PPP$) এই সর্বাধিক আয়ের বাট্টাকৃত মান হল $6,154 (PPP$)। আয়সূচক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা আয়ের সর্বাধিক মান বলতে এই বাট্টাকৃত মানটিকেই গ্রহণ করবো।

আমরা নীচে HDI গঠন করার পদ্ধতির একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা দুটি দেশ নিয়েছি ঃ গ্রিস ও গ্যাবন। প্রথমটি শিল্পোন্নত দেশ ; দ্বিতীয়টি উন্নয়নশীল দেশ। HDI নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে দুটি দেশের তথ্য নীচে দেওয়া হল।

দেশ	আয়ু প্রত্যাশা (বছরে)	বয়স্ক সাক্ষরতার হার (%)	সম্মিলিত ভর্তির হার (%)	মাথাপিছু প্রকৃত GDP (PPP $)
গ্রিস	77.8	96.7	82	11,265
গ্যাবন	54.1	62.6	60	3,641

প্রত্যাশিত আয়ু সূচক ঃ

গ্রিস ঃ $\frac{77.8-25}{85-25}=\frac{52.8}{60}=0.880$

গ্যাবন ঃ $\frac{54.1-25}{85-25}=\frac{29.1}{60}=0.485$

বয়স্ক সাক্ষরতার সূচক ঃ

গ্রিস ঃ $\frac{96.7-0}{100-0}=\frac{96.7}{100}=0.967$

গ্যাবন ঃ $\frac{62.6-0}{100-0}=\frac{62.6}{100}=0.626$

সম্মিলিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরে মোট ভর্তির সূচক ঃ

গ্রিস ঃ $\frac{82-0}{100-0}=\frac{82}{100}=0.820$

গ্যাবন ঃ $\frac{60-0}{100-0}=\frac{60}{100}=0.600$

শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক

গ্রিস ঃ $(2 \times 0.967 + 1 \times 0.820) \div 3 = 2.754 \div 3 = 0.918$

গ্যাবন ঃ $(2 \times 0.625 + 1 \times 0.600) \div 3 = 1.850 \div 3 = 0.617$

সংশোধিত মাথাপিছু প্রকৃত GDP (PPP $) সূচক

গ্রিসের মাথাপিছু প্রকৃত GDP হল $11,265 (PPP$)। এটি নির্ধারিত ভিত্তিসীমার ($6154) চেয়ে বেশি। সুতরাং, গ্রিসের আয়ের বাট্টা করতে হবে। Atkinson-এর সূত্র বসিয়ে গ্রিসের বাট্টাকৃত মাথাপিছু প্রকৃত GDP দাঁড়ায় $ 5,982 (PPP $)। গ্যাবনের মাথাপিছু প্রকৃত GDP নির্ধারিত ভিত্তিসীমার চেয়ে কম। সুতরাং এক্ষেত্রে আয়ের কোন সংশোধনের (adjustment) প্রয়োজন নেই। তাহলে ঐ দুই দেশের প্রকৃত মাথাপিছু GDP সূচক নিম্নরূপ ঃ

গ্রিস ঃ $\frac{5,982-100}{6,154-100}=\frac{5,882}{6,054}=0.972$

গ্যাবন ঃ $\frac{3,641-100}{6,154-100}=\frac{3,541}{6,054}=0.584$

HDI হল প্রত্যাশিত আয়ু সূচক, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক এবং সংশোধিত মাথাপিছু প্রকৃত GDP সূচকের সরল যৌগিক গড়। সুতরাং, ঐ তিনটি সূচকের যোগফলকে 3 দ্বারা ভাগ করলেই ঐ দুটি দেশের HDI পাওয়া যাবে।

দেশ	প্রত্যাশিত আয়ু সূচক	শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক	সংশোধিত মাথাপিছু প্রকৃত GDP (PPP $) সূচক	তিনটি সূচকের যোগফল	HDI (= তিনটি সূচকের যোগফল ÷ 3)
গ্রিস	0.880	0.918	0.972	2.770	0.923
গ্যাবন	0.485	0.617	0.584	1.686	0.562

সূত্র ঃ UNDP, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, 1997, পৃঃ 122

1.3. অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত অর্থনীতির সংজ্ঞা (Definition of an Underdeveloped Economy) :

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সাধারণভাবে অনুন্নত অর্থনীতির বর্ণনায় বলা হয় যে, এটি এরূপ একটি দেশ যার মাথাপিছু আয় স্বল্প এবং এই আয়ের স্বল্পতার পিছনে কারণ হল দেশটির উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহারের অভাব। মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা অবশ্য লক্ষণমাত্র। আসল বিষয় হ'ল, উন্নয়নের ক্ষমতার অপূর্ণ ব্যবহার এবং এর ফলেই মাথাপিছু আয় কম। সাধারণভাবে বলা যায়, **স্বল্পোন্নত দেশ হ'ল সেই দেশ যার বর্তমান মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় যথেষ্ট কম এবং ফলে জীবনযাত্রার মান খুব নিম্ন কিন্তু যার অর্থনৈতিক উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।** সাধারণতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মাপকাঠি ধরে, যে সকল দেশের মাথাপিছু আয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয়ের এক-চতুর্থাংশেরও কম তাদের স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত অর্থনীতি বা দেশ বলা হয়। Jacob Viner বলেছেন যে, **অনুন্নত দেশ হল সেই দেশ যার আরও মূলধন বা আরও শ্রম বা আরও প্রাকৃতিক সম্পদ অথবা এর সবগুলোই ব্যবহার করে এর বর্তমান জনসংখ্যার জন্য উচ্চতর জীবনযাত্রার মান অর্জনের যথেষ্ট ক্ষমতা বা সম্ভাবনা রয়েছে।** (An underdeveloped country is one which has good potential or prospects for using more capital, or more labour, or more available natural resources, or all of these to support its present population on a higher level of living).

ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের মতে, "যে সব দেশে অব্যবহৃত বা স্বল্প ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি অব্যবহৃত বা স্বল্প ব্যবহৃত মানবিক সম্পদের সহাবস্থান দেখা যায় তাদের অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল অনুন্নত দেশে মূলধনের স্বল্পতা দেখা যায়। মূলধনের অভাবের জন্যই ঐ সমস্ত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শ্রম সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ফলে মাথাপিছু উৎপাদন কম হয় এবং শ্রমের বেকারত্ব দেখা দেয়। সেই সঙ্গে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদও লক্ষ করা যায়। তাই অনেকের মতে, যে সমস্ত অর্থনীতিতে অব্যবহৃত শ্রম সম্পদ, অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মূলধনের স্বল্পতা রয়েছে, সে সমস্ত অর্থনীতিকেই স্বল্পোন্নত অর্থনীতি বা অনুন্নত অর্থনীতি বলা যেতে পারে। জাতিপুঞ্জের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর লোকেদের মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের তুলনায় যে সব দেশের লোকেদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম, সেই দেশগুলোকেই স্বল্পোন্নত দেশ বলা হয়। এম. ই. স্ট্যালি অনুন্নত দেশের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, যে দেশে গণ দারিদ্র্য প্রকটভাবে স্থায়ী, যা সাময়িক কোনো বিপর্যয়ের ফলে ঘটেনি, যেখানে অপ্রচলিত ও সাবেকি উৎপাদন পদ্ধতি ও সমাজ সংগঠন দারিদ্র্যের অস্তিত্বকে আরও স্থিতিশীল করেছে কিন্তু যেখানে পরীক্ষিতভাবে সফল পদ্ধতির দ্বারা দারিদ্র্য প্রশমিত করা যায়, সেই দেশকেই অনুন্নত দেশ বলা যায়।

এই সমস্ত সংজ্ঞা হতে স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত অর্থনীতির **তিনটি মৌল লক্ষণের** উল্লেখ করা যেতে পারেঃ **(ক) মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, (খ) দারিদ্র্য বা জীবনযাত্রার নিম্ন মান এবং (গ) উন্নয়নের সম্ভাবনা।** পাশাপাশি, স্বল্পোন্নত অর্থনীতির এই সমস্ত সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে আমরা স্বল্পোন্নত অর্থনীতি সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্যও করতে পারি।

প্রথমত, আমরা জানি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান মানদণ্ড হল দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধি। এখন, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার হল প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ব্যবধান। অনেক দেশেই দেখা যাবে যে, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বিশেষ বাড়ছে না অথবা বাড়লেও তা খুব ধীর গতিতে বাড়ছে। বলতে গেলে, এ সমস্ত দেশগুলো যেন একটা অনড়, অচল অবস্থার মধ্যে রয়েছে (stagnating)। আমাদের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির উপরোক্ত সূত্র হতে আমরা এই সমস্ত দেশের এই প্রায় নিশ্চল অবস্থার দু'টি প্রধান কারণ নির্দেশ করতে পারি। হয় এই সমস্ত দেশে জমি কিংবা শ্রম কিংবা উভয়েরই উৎপাদনশীলতা খুব কম অথবা / এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি। ফলে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বিশেষ বাড়ছে না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও মনে রাখা দরকার। কোন বিশেষ সময়কালে কোন স্বল্পোন্নত দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার কোন উন্নত দেশের ঐ হারের চেয়ে বেশি হতে পারে। বিশেষত অনুন্নত দেশটির ভিত্তি বৎসরের আয়ের কম মানের দরুন এরূপ ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং, প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হারকেই উন্নয়নের মাপকাঠি বলে ধরলে চলবে না। উন্নতির বা অনুন্নতির স্তর সম্পর্কে জানতে হলে বর্তমান জীবনযাত্রার মানের স্তর বা বর্তমান মাথাপিছু আয়স্তরকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। সুতরাং, উন্নতি বা অনুন্নতি হল একটি আপেক্ষিক বা তুলনামূলক ধারণা। আমরা উন্নয়নের একটা মইয়ের কথা কল্পনা করতে পারি। কিছু দেশ এই মইয়ের অনেক উপরে উঠে গেছে ; কিছু দেশ মইয়ের মাঝামাঝি উচ্চতায় অবস্থান করছে ও আরো উপরে ওঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর কিছু দেশ অসহায়ভাবে মইয়ের নীচের দিকে পড়ে আছে।

অনুন্নতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করার সময় আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশ বলতে কখনোই আমরা এটা বোঝাচ্ছি না যে, দেশটির উন্নয়নের কোনো সম্ভাবনাই নেই বা অচল, অনড় অবস্থাই এর ভবিষ্যৎ বিধিলিপি (forever doomed to stagnation)। আসলে দেশটির সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ঘটে নি, আর তাই এর মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম। জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ক্ষমতা দেশটির আছে। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল উপাদানগুলোও দেশটির আছে। কিন্তু উপযুক্ত উদ্যোগের অভাবে সেগুলোর সদ্ব্যবহার ঘটেনি। উন্নয়নের এই উপাদানগুলোর সদ্ব্যবহার ঘটলেই দেশটি অনুন্নতির কানাগলি হতে উন্নতির রাজপথে এসে পৌঁছবে এবং উন্নতির দিকে যাত্রা শুরু হবে।

তাহলে আমরা বিশ্বের দেশগুলোকে মোটের উপর দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। কিছু দেশ রয়েছে যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ঘটিয়েছে। তাদের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। এগুলো হল উন্নত দেশ। এরা উচ্চ মাথাপিছু আয় ভোগ করছে। অন্যদিকে রয়েছে বহু দেশ যারা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারে নি। এরা অনুন্নত দেশ। উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে এই শ্রেণিবিভাগ সাধারণত মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে করা হয়। অবশ্য অনেক অর্থনীতিবিদই কেবলমাত্র প্রকৃত আয় বৃদ্ধিকে উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি বলে মানতে নারাজ। যেমন, অধ্যাপক টোডারো অনুন্নতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, শুধু বস্তুগত বিচারে স্থূল জাতীয় উৎপাদন বা মাথাপিছু উৎপাদন বাড়লেই তাকে অর্থনৈতিক উন্নতি বলা ঠিক হবে না। যদি দেখা যায় যে, জাতীয় বা মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্য, আয় বৈষম্য ও বেকারত্ব কমছে, তবেই অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে বলা যাবে। একথা স্বীকার্য যে, উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তবু এখনও পর্যন্ত এটাই উন্নয়নের সূচক বা মাপকাঠি হিসাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে জনপ্রিয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ এবং সংগঠন উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয়কেই ব্যবহার করে থাকে বা থাকেন। এটা অবশ্য কখনও কখনও ভুল সিদ্ধান্ত দিতে পারে। যেমন, মাথাপিছু আয়কে উন্নয়নের মাপকাঠি ধরলে কুয়েতকে উন্নত দেশ বলতে হয় যা আদৌ সত্য নয়। রাষ্ট্র সংঘ অথবা বিশ্ব ব্যাঙ্ক অবশ্য এই সমস্ত দেশকে 'তেল রপ্তানিকারী দেশ' বলে উল্লেখ করেছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের উন্নত ও অনুন্নত শ্রেণিতে ভাগ করা আদৌ সন্তোষজনক নয়। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, যে সমস্ত দেশ তাদের উৎপাদন ক্ষমতা সদ্ব্যবহারের বাধাগুলি দূর করতে সক্ষম হয়েছে এবং উচ্চ মাথাপিছু আয় অর্জনের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে, সেই সমস্ত দেশই উন্নত দেশ। অন্যদিকে, যে সমস্ত দেশ উন্নয়নের বাধাগুলোকে দূর করে তাদের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে নি এবং তার ফলে তাদের মাথাপিছু আয় নিম্নস্তরে রয়ে গেছে, সেই দেশগুলোই অনুন্নত দেশ। এভাবে, কোন্ দেশ উন্নয়নের বাধা কতটা দূর করতে পেরেছে, সেটিও উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করলে উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে পার্থক্য বিচার করা আরও অর্থবহ হবে বলে মনে হয়।

1.4. অনুন্নতির বৈশিষ্ট্য

(Characteristics of Underdevelopment) :

স্বল্পোন্নত অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এরূপ অর্থনীতির কয়েকটি মৌল বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। পৃথিবীর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। বিভিন্ন স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের স্তরও সমান নয়। অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা, পেরু ও চিলি, মিশর ও বাংলাদেশ—এরা কখনোই এক রকমের নয়। স্বভাবতই কোনো একটা বিশেষ সংজ্ঞা দিয়ে সমস্ত স্বল্পোন্নত অর্থনীতির প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। তবুও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর **কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য** লক্ষ করা যায়। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

1. কম মাথাপিছু আয় ঃ স্বল্পোন্নত দেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু আয় খুবই কম। এরূপ দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনগুলো অদক্ষ ও অনুন্নত। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোও দুর্বল। তাছাড়া, স্বল্পোন্নত দেশে উন্নত কারিগরি জ্ঞানের অভাব। ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ কম। জনসংখ্যার তুলনায় জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ কম বলে মাথাপিছু আয় খুবই কম। জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ দারিদ্র্যের মধ্যে দিনযাপন করে। জনসাধারণের আয় কম বলে জীবনযাত্রার মানও খুব নিম্ন। তারা নানা অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে এবং দেশের জনসাধারণের প্রত্যাশিত গড় আয়ু খুবই কম হয়।

2. কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ঃ স্বল্পোন্নত অর্থনীতি একান্তরূপে কৃষিনির্ভর। এরূপ অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ কৃষি থেকে উদ্ভূত হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে নিযুক্ত। জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক বা তার বেশি আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। কিন্তু স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হ'লেও কৃষিব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। কৃষির উৎপাদন কৌশল সাবেকি ও প্রাচীন ধরনের। ফলে শ্রমিক পিছু বা একর পিছু উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। এখানে চাষিরা মূলত নিজেদের পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃষিকার্য ক'রে থাকে। বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদন করে না বললেই চলে। অর্থাৎ বাণিজ্যিক কৃষি প্রসার লাভ করে নি। এখানে চাষবাসের উদ্দেশ্য হ'ল পরিবারের ভরণপোষণ (subsistence farming)।

স্বল্পোন্নত দেশে কৃষির এত বেশি গুরুত্বের পিছনে মূলতঃ দু'টি বিষয় কাজ করে। **প্রথমত,** কৃষিকার্যে সাধারণ শিক্ষা বা কারিগরি জ্ঞান কোনোটারই বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তাই স্বল্পোন্নত দেশে অশিক্ষিত ও কারিগরি জ্ঞানবর্জিত জনসাধারণের পক্ষে কৃষিই হ'ল উপযুক্ত জীবিকা। **দ্বিতীয়ত,** স্বল্পোন্নত দেশের জনসাধারণের একটা বড় অংশই দরিদ্র ও সঙ্গতিহীন। এরূপ লোকেদের কাছে কৃষিই একমাত্র উপযুক্ত পেশা, কারণ সাবেকি কৃষি ব্যবস্থায় একসঙ্গে খুব বেশি মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। এ সমস্ত কারণেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কৃষির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

3. মূলধন স্বল্পতা ঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে মূলধনের বড়ই অভাব। মূলধনের স্বল্পতা এ সমস্ত দেশে একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ ও ফল। নার্কসের মতে, মূলধনের স্বল্পতার জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে **'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র'** কাজ করে। স্বল্পোন্নত দেশে মাথাপিছু আয় কম বলে সঞ্চয় কম। সঞ্চয় কম বলে মূলধন গঠনের হারও কম হয়। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম। আর উৎপাদনশীলতা কম বলে আয় কম। এভাবে মূলধনের যোগানের দিক থেকে একটা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। আবার, মূলধনের চাহিদার দিক থেকেও অনুরূপ একটি দুষ্টচক্র কাজ করে। অনুন্নত দেশে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় কম বলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কম। ফলে দেশীয় বাজার খুব একটা বড় নয়। এজন্য বিনিয়োগকারীরা খুব বেশি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। এর ফলেও মূলধন গঠনের হার কম হয় ও শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম থাকে। ফলে শ্রমিকের আয় কম। এভাবে মূলধনের অভাব স্বল্পোন্নত দেশকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ রাখে।

4. শিল্পে অনগ্রসরতা ঃ স্বল্পোন্নত দেশ সাধারণভাবে শিল্পে অনগ্রসর। এরূপ দেশে অধিকাংশ শিল্পই হ'ল ভোগ্যপণ্য শিল্প। এসব শিল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষিজ কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। মূলধনী দ্রব্য শিল্প গড়ে

না ওঠায় স্বল্পোন্নত দেশে মূল ও ভারী শিল্প তেমন গড়ে ওঠে নি। মূলধনী দ্রব্য শিল্প গড়ে না ওঠায় স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পের বনিয়াদ খুব দৃঢ় নয়। প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয় এবং লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিকূলতা দেখা দেয়।

5. জনসংখ্যার চাপ ঃ অধিকাংশ স্বল্পোন্নত অর্থনীতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ। এরূপ অর্থনীতিতে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ে, জাতীয় আয় সেই হারে বাড়ে না। ফলে মাথাপিছু আয় খুব ধীর গতিতে বাড়ে। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হবার সাথে সাথেই মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পায়। কিন্তু জন্মহার মোটামুটি একই থাকে। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। দ্রুত হারে জনসংখ্যার ভোগব্যয় মেটানোর জন্য উৎপাদনের একটি বড় অংশই ব্যয় করতে হয়। ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন খুব কম হয়। এভাবে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

6. বেকারত্ব ঃ স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশি। অথচ বিনিয়োগের হার খুবই কম। এ সমস্ত দেশে শিল্প তেমন প্রসার লাভ করে নি। তাই শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে স্বল্পোন্নত দেশে দেখা দেয় গণ-বেকারত্ব। শিল্পে নিয়োগের সুযোগ কম হওয়ায় বর্ধিত জনসংখ্যা কৃষিতে ভিড় করে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের কৃষিপদ্ধতি চিরাচরিত ও সাবেকি ধরনের। সারা বছর কৃষিকার্য চলে না, বছরের কয়েকটি ঋতুতে কৃষিকার্যে ব্যস্ততা লক্ষ করা যায়। ফলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা কৃষিক্ষেত্রে এসে ভিড় করলে কৃষিতে দেখা দেয় অর্ধ-বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। এই অর্ধ-বেকারত্ব ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের সঙ্গে উন্মুক্ত বেকারত্ব যুক্ত হয়ে স্বল্পোন্নত দেশে ভয়াবহ বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে।

7. ঔপনিবেশিক বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলো প্রধানত কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করে। এরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যকে ঔপনিবেশিক বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে কৃষিক্ষেত্রটিই প্রধান ক্ষেত্র। এই অর্থনীতির রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাধান্য বেশি থাকে। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে শিল্পের খুব বেশি বিকাশ ঘটে নি। ফলে ঐ অর্থনীতি বিদেশ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। এরূপ ক্ষেত্রে বাণিজ্য হারও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিপক্ষে যায়। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিজ কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য কম দামে রপ্তানি করে, বিনিময়ে অধিক দাম দিয়ে শিল্পজাত দ্রব্য কেনে। ফলে এই দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রায়ই ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

8. নিম্ন মানের মানবিক মূলধন ঃ স্বল্পোন্নত দেশের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল মানবিক মূলধনের নিম্ন মান। স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার ব্যাপক অংশ নিরক্ষর। ফলে তাদের কাজকর্মে ও চিন্তাভাবনায় প্রগতিশীলতার অভাব। নানা কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতায় তাদের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন। শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের খুবই অভাব। এ সমস্ত কারণে শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। তাছাড়া, ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী এরূপ উদ্যোক্তারও অভাব লক্ষ করা যায়। এছাড়া, নানারকম কুসংস্কারের ফলে শ্রম ও মূলধনের চলনশীলতা খুব কম থাকে। এ সমস্ত কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যার গুণগত মান খুবই নিম্নে থাকে।

9. দ্বৈত অর্থনীতি ঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে একটি দ্বৈত অর্থনীতি লক্ষ করা যায়। অর্থনীতিটি যেন দু'টি ক্ষেত্রে বিভক্ত। একটি উন্নত ক্ষেত্র এবং অপরটি অনুন্নত ক্ষেত্র। উন্নত ক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজে আধুনিক কলাকৌশল গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে, অনুন্নত ক্ষেত্রটিতে উৎপাদন কৌশল প্রাচীন ও সাবেকি ধরনের। স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে এই দু'টি ক্ষেত্র দু'টি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো সহাবস্থান করে। একটি ক্ষেত্র অপর ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে না অর্থাৎ উন্নয়নের সুফল উন্নত ক্ষেত্র থেকে অনুন্নত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে না। আবার, অনুন্নত ক্ষেত্রও উন্নত ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে না। দু'টি ভিন্ন ধরনের অর্থনীতি যেন পাশাপাশি বিরাজ করে। একেই দ্বৈত অর্থনীতি বলে।

10. আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য ঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দেখা যায়। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতেই অধিক আয় ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। মোট জনসংখ্যার একটা নগণ্য অংশের আয় ও সম্পদ বেশি। কিন্তু

Acc No - 330| Eco | 51.2

জনসংখ্যার বিশাল অংশ গণ-দারিদ্র্য ও গণ-বেকারত্বের মধ্যে দিন কাটায়। আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন স্বল্পোন্নত দেশগুলোর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

11. প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার ঃ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্প বা অপূর্ণ ব্যবহার। অর্থনৈতিক অনুন্নতির এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ। প্রায় সবস্তু স্বল্পোন্নত দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদকে ঠিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা নেই। প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করতে না পারার জন্যই অনেক দেশ অনুন্নত রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত থাকার পিছনে দু'টি প্রধান কারণ রয়েছে। **প্রথমত,** প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার জন্য যে মূলধন প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশে সেই মূলধনের অভাব লক্ষ করা যায়। মূলধনের অভাবের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। **দ্বিতীয়ত,** প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহারের কারণ হ'ল উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞানের অভাব। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার জন্য যে কারিগরি জ্ঞান প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশে সেই কারিগরি জ্ঞানের অভাব রয়েছে। ফলে অনেক স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত রয়েছে এবং সেজন্যই ঐ সব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে না।

12. অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঃ উপরের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কিছু অন-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। এগুলো হ'ল ঃ (i) নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা, (ii) পরিবর্তনবিমুখ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ কাঠামো, (iii) শিশু শ্রমিকের আধিক্য, (iv) সমাজে নারীদের নীচু স্থান ও অপুষ্টি, (v) উচ্চ শিশু মৃত্যুর হার, (vi) জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার অভাব, (vii) অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন প্রভৃতি।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অনুন্নতিকে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চেনা যায়। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি যে সকল প্রধান বিষয়ের উপর আলোকপাত করে সেগুলো হ'ল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, বাজারের অসম্পূর্ণতা এবং অর্থনীতিটির দ্বৈতাবস্থা। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো একই সঙ্গে ঐ দেশে বিদ্যমান অনুন্নতির কারণ ও ফল উভয়ই। অনুন্নতির কারণগুলোকে (causes) তাদের ফল (effects) হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না কারণ তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

1.4.1. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র (Vicious Circle of Poverty) ঃ

Ragnar Nurkse তাঁর সুবিখ্যাত "Problems of Capital Formation" গ্রন্থে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেন। স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশে অনুন্নতির স্থায়িত্ব (persistence) ব্যাখ্যা করতে নার্কস এই ধারণাটির অবতারণা করেন। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটির মূল কথা হ'ল ঃ **একটি দেশ দরিদ্র কারণ তার মূলধন কম, আর মূলধন কম কারণ দেশটি দরিদ্র।** (A country is poor because it has little capital, and it cannot raise capital because it is poor)। সেজন্য অনেক সময় হাল্কাভাবে ধারণাটিকে এরূপভাবে ব্যক্ত করা হয় ঃ একটি দেশ দরিদ্র কারণ সে দরিদ্র। (A country is poor as it is poor)। নার্কসের মতে, অনুন্নত দেশে একটি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে এবং এই দুষ্টচক্রই দেশটিকে দরিদ্র বা অনুন্নত করে রাখে অর্থাৎ যেন বলা হচ্ছে, দারিদ্র্যই দারিদ্র্যের কারণ। তাই 'দুষ্টচক্র' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

চিত্র ঃ 1.1

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি দুটি চিত্রের (চিত্র 1.1 ও চিত্র 1.2) সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। নার্কসের মতে, মূলধনের চাহিদা ও মূলধনের যোগান উভয় দিক হতেই একটি চক্রাকার বা বৃত্তাকার শক্তি কাজ করে। মূলধনের চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হতেই দুষ্টচক্রের ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা যায়। মূলধনের যোগানের (চিত্র 1.1) দিক থেকে দেখতে গেলে, অনুন্নত দেশে

মূলধনের যোগান কম কারণ সঞ্চয় কম। আর সঞ্চয় কম কারণ আয় কম। আয় কম হবার কারণ হ'ল কম উৎপাদনশীলতা। কম উৎপাদনশীলতার কারণ হল শ্রমিকের মাথাপিছু মূলধন কম। আর মাথাপিছু মূলধন কম হবার কারণ হ'ল মূলধনের কম যোগান। এভাবে মূলধনের যোগানের দিক হতে বৃত্তটি সম্পূর্ণ। বৃত্তটির পরিধির দুই প্রান্তবিন্দু একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। অধ্যাপক Hicks মন্তব্য করেছেনঃ "The snake eats its own tail".

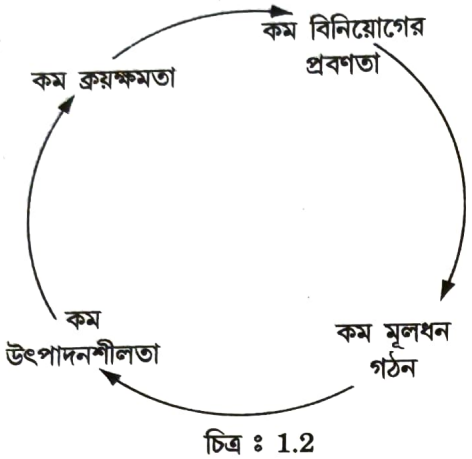

চিত্র ঃ 1.2

মূলধনের চাহিদার দিক হতেও বৃত্তটি সম্পূর্ণ (চিত্র 1.2)। অনুন্নত দেশে মূলধনের চাহিদা কম কারণ এখানে উৎপাদকদের বিনিয়োগ করার প্রবণতা কম। আর বিনিয়োগ প্রবণতা কম কারণ অভ্যন্তরীণ বাজার সংকীর্ণ। দ্রব্যসামগ্রীর বাজার বা চাহিদা নেই কারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা কম। আর লোকের ক্রয়ক্ষমতা কম কারণ তাদের উৎপাদনশীলতা কম। উৎপাদনশীলতা কম হবার কারণ হ'ল শ্রমিকপিছু মূলধনের ব্যবহার বা চাহিদা কম। এভাবে মূলধনের চাহিদার দিক হতেও বৃত্তটি সম্পূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। অনুন্নত দেশে মূলধনের চাহিদা কম, এই কথাটি আপাতবিরোধী মনে হতে পারে। আমরা জানি, অনুন্নত দেশে মূলধনের অভাব অর্থাৎ এখানে মূলধনের যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি। কিন্তু নার্কসের যুক্তি হল, অনুন্নত দেশে লোকের ক্রয়ক্ষমতা কম। ফলে এখানে অভ্যন্তরীণ বাজার সীমিত। ফলে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রবণতা কম কারণ তাদের বিনিয়োগ করার ইচ্ছা বাজারের আয়তন বা বিস্তৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাই এরূপ দেশে মূলধনের যোগান যেমন কম, চাহিদাও কম। উভয় কারণেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ।

এভাবে, নার্কসের ভাষায়, **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হল এমন কতকগুলো শক্তির একত্র সমাবেশ যারা একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি দরিদ্র দেশকে দারিদ্র্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখে** (A vicious circle of poverty is the circular constellation of forces tending to act and react upon one another so as to keep a poor country in a state of poverty)।

বাজারের অপূর্ণতা
↑ ↓
অনুন্নত প্রাকৃতিক সম্পদ
↑ ↓
পশ্চাদ্‌গামী মনোভাব

অধ্যাপক Meier এবং অধ্যাপক Baldwin দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটিকে আরও একভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে, বাজারের অপূর্ণতা, অনুন্নত প্রাকৃতিক সম্পদ ও দেশের জনসাধারণের পশ্চাদ্‌গামী মনোভাব একটি দেশকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের আবর্তে নিক্ষেপ করতে পারে। পাশের ছকের সাহায্যে আমরা এটি দেখিয়েছি। এই তিনটি বিষয় একে অপরকে পুষ্ট করে। এর ফলে একটি দরিদ্র দেশ দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকে থাকে।

☐ কীভাবে এই দুষ্টচক্র ভাঙা যাবে ? (How to break this Vicious Circle ?)

এখন প্রশ্ন হ'ল, কীভাবে এই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙা যাবে ? অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলকথা হল এই দুষ্টচক্রকে কোনো না কোনো বিন্দুতে ছেদ করা। নার্কস মনে করেন যে, এই দুষ্টচক্রকে ভাঙা সম্ভব। তাঁর মতে, এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে বাজার প্রসারিত করতে হবে। তাহলে প্রশ্ন হ'ল, একটি অনুন্নত দেশের বাজার কীভাবে প্রসারিত করা যাবে ? যেহেতু একটি স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে বিদেশের বাজার দখল করা খুবই কঠিন, তাই অভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারিত করতে হবে। এজন্য অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। নার্কসের মতে, এর জন্য প্রয়োজন দেশটির সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো। শুধুমাত্র একটি শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ালে ঐ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় বাড়বে এবং ঐ শিল্পের উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু ঐ বর্ধিত উৎপাদনের সবটাই বিক্রি হবে না কারণ কেবলমাত্র ঐ শিল্পে নিযুক্ত লোকেদের আয় বেড়েছে। তারা তাদের বর্ধিত আয়ের সবটাই ঐ শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যে ব্যয় করবে না। ফলে দেখা দেবে অতিরিক্ত

যোগানের সমস্যা। তাই নার্কসের মতে, সমস্ত প্রধান শিল্পে একযোগে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তাহলে একের যোগান অপরের চাহিদার দ্বারা নিঃশেষিত হবে। স্পষ্টতই এক্ষেত্রে নার্কসের যুক্তির ভিত্তি হল Say's Law যার মূলকথা হল "Supply creates its own demand". কিন্তু সমস্ত প্রধান শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে চাই বিপুল পরিমাণ মূলধন। সেই মূলধন কোথা থেকে আসবে ? নার্কসের তত্ত্বে তার উত্তর পাওয়া যায় না। নার্কস বলেছেন, মূলধন কোথা থেকে আসবে সেটি মূলধনের যোগানের প্রশ্ন এবং সেটিকে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে হবে। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে নার্কস দেশীয় বাজার প্রসারিত করতে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বলেছেন। এর জন্য তিনি সমস্ত প্রধান শিল্পে একসঙ্গে বিনিয়োগ করতে বলেছেন। একযোগে সমস্ত প্রধান শিল্পে বিনিয়োগের দ্বারা উন্নয়নের এই কৌশলকে এক কথায় বলা হয় সুষম উন্নয়ন কৌশল। নার্কস এই সুষম উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম প্রবক্তা। দেখা যাচ্ছে যে, নার্কস সুষম উন্নয়ন কৌশলকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার কৌশল বা শক্তি হিসেবে দেখেছেন।

কিন্তু Hirschman এবং Singer মনে করেন যে, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র একটি অনুন্নত দেশের যে অনড়তা নির্দেশ করে তা ভাঙতে হলে **অসম উন্নয়ন কৌশল** গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁদের যুক্তি, বিনিয়োগের জন্য কিছু শিল্পকে নির্বাচন করতে হবে। তাহলে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেশি তৈরি হবে। আবার, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য Rosenstein-Rodan **জোর ধাক্কা** দেওয়ার কথা বলেছেন। আর অনুন্নত দেশের অর্থনীতিকে স্বয়ংচালিত উন্নয়নের পথে টেনে তুলতে গেলে একটা **একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা** প্রয়োজন বলে Leibenstein মনে করেন।

আবার মূলধনের যোগানের দিক হতেও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রটি ভাঙা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি করা। দেশে সমস্ত রকমের অপচয় বন্ধ করতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে হবে। তবেই সঞ্চয়ের হার বাড়বে। তাছাড়া বিভিন্ন উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমেও সঞ্চয়ের অনুপ্রেরণা বাড়ানো যেতে পারে। এছাড়া অনুন্নত দেশের কৃষিক্ষেত্রের প্রচ্ছন্ন বেকারি সুপ্ত সঞ্চয় হিসাবে বিরাজ করে। যদি এই প্রচ্ছন্ন বেকারদের মূলধন প্রকল্পে নিয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহলেও মূলধন গঠনের হার বা সঞ্চয়ের হার বাড়বে। নার্কস এবং লুইস আলাদা আলাদাভাবে এরূপ মূলধন গঠনের কথা বলেছেন।

সবশেষে, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও সামনাসামনি আঘাত হানা প্রয়োজন। মূলধনের যোগান ও মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির পথে যে সমস্ত বাধা বা অন্তরায় আছে, সেগুলো কার্যকরীভাবে দূর করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারের প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করা এবং ঐ সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করা।

☐ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণাটির সীমাবদ্ধতা (Limitations)

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ধারণাটির কয়েকটি **সীমাবদ্ধতা** আছে।

প্রথমত, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র অনুন্নতির কারণ হিসাবে মূলধনের অভাবকে দায়ী করেছে। কিন্তু অনুন্নতির পিছনে এটা অন্যতম প্রধান কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, কারিগরি জ্ঞানের অভাব, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, উদ্যমের অভাব ইত্যাদি কারণেও একটি দেশ অনুন্নত থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত, Nurkse দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন। কিন্তু Hirschman এবং Singer মনে করেন যে, অনুন্নত দেশের প্রাথমিক অচলতা ও অনড়তা (initial deadlock) কাটাতে গেলে অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়ত, দুষ্টচক্র তত্ত্বের মূল যুক্তিকে (নিম্ন আয়ের জন্যই নিম্ন আয় বা দারিদ্র্যই দারিদ্র্যের কারণ) যদি সত্য বলে ধরা হয়, তাহলে বিশ্বের পূর্বতন কিছু দরিদ্র দেশ বর্তমানে উন্নত দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করত না।

চতুর্থত, দুষ্টচক্র তত্ত্বে ধরা হয়েছে যে, অনুন্নত দেশে সঞ্চয় বলতে বিশেষ কিছু হয় না। আর এজন্যই এই দেশগুলো অনুন্নত। পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলে। অনুন্নত দেশেও সঞ্চয়ের পরিমাণ বরাবরই যথেষ্ট বেশি ছিল, অন্তত সঞ্চয় যতটা কম বলে মনে করা হয়, ততটা কম নয়। যেমন, সঞ্চয় যদি না হত, তাহলে

ভারতে তাজমহলের ন্যায় সৌধ এবং আরও অসংখ্য দুর্গ ও মন্দির তৈরি হ'ত না, মিশরে পিরামিড তৈরি হত না। এগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, সে যুগেও উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। বর্তমানেও অনেক অনুন্নত দেশে সঞ্চয়ের হার যথেষ্ট বেশি। সমস্যা সঞ্চয়ের অপ্রতুলতার নয়, সমস্যা হ'ল সঞ্চয়ের উপযুক্ত ব্যবহারের। রিকার্ডোর মতে, সঞ্চয় সৃষ্টিকারী শ্রেণির নিকট হতে উদ্বৃত্ত বা সঞ্চয় নিঃসরণ করতে না পারা এবং তা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে না পারাই হ'ল পশ্চাদ্‌গামিতার (backwardness) মূল কারণ।

পঞ্চমত, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে অনুন্নতির কারণ হিসেবে যেগুলো দেখানো হয়েছে তার অনেকগুলিই একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ ও ফল। যেমন, কোন ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা কম বলে সে দরিদ্র। আবার, দরিদ্র বলেই তার সুস্বাস্থ্য এবং উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের দরুন উৎপাদনশীলতা কম। এক্ষেত্রে কম উৎপাদনশীলতা একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ ও ফল। Higgins তাই বলেছেন যে, অনুন্নতির কারণ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে দুষ্টচক্র তত্ত্বে 'Egg and Hen' জাতীয় সমস্যা (অর্থাৎ ডিম আগে না মুরগি আগে ?) রয়েছে।

ষষ্ঠত, Leibenstein মনে করেন যে, দুষ্টচক্র তত্ত্বে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কীভাবে ভাঙা যাবে তার সদুত্তর নেই। দুষ্টচক্র ভাঙতে গেলে সঞ্চয় উৎসাহিত করতে হবে, সরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করতে হবে, উপযুক্ত কৌশল ও ক্ষেত্র নির্বাচন করে সেখানে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে প্রভৃতি।

সপ্তমত, Nelson মনে করেন যে, স্বল্পোন্নত দেশের অনুন্নতির একটা বড় কারণ হ'ল জনসংখ্যার চাপ। জনসংখ্যার উচ্চ হারে বৃদ্ধির দরুনই এ সমস্ত দেশে মাথাপিছু আয় তথা জীবনযাত্রার মান বাড়ছে না। দরিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্বে এই জনসংখ্যার সমস্যার উপর কোন আলোকপাত করা হয় নি।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, এ সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বে নিম্ন আয়ের কারণ হিসাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অপ্রতুলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, অনুন্নতির পিছনে এগুলো অন্যতম প্রধান কারণ। অবশ্য বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, তারা কখনোই এক জাতীয় নয়। ফলে অনুন্নতির বৈশিষ্ট্য এবং তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব দেশে দেশে ভিন্ন। তাই অনুন্নতির কারণ হিসাবে কোন 'সাধারণ বিষয়' (common factor) উল্লেখ করা সম্ভব নয়। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র তত্ত্বে অনুন্নতির কারণ হিসাবে মূলধনের অভাবকেই দায়ী করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয় এখানে কিছুটা উপেক্ষিত। সেদিক থেকে বিচার করে এই তত্ত্বটিকে কিছুটা একপেশে (one-sided) বলে অনেকে মনে করেন।

1.5. অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধাসমূহ (Obstacles to Economic Development) :

স্বল্পোন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেগুলোকেই বলা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধা। এগুলোর জন্যই অনুন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে না। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন বাধার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এই বাধাগুলো সব দেশের পক্ষে সমান নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যে সমস্ত বাধা লক্ষ করা যায় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাধাগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

1. জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ (Polpulation pressure) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধারণত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দ্বারা পরিমাপ করা হয়। আমরা জানি, মাথাপিছু প্রকৃত আয় ≡ প্রকৃত জাতীয় আয় ÷ মোট জনসংখ্যা। প্রতীকের সাহায্যে লিখতে গেলে, $y \equiv \frac{Y}{P}$. উভয় পক্ষের log নিয়ে পাই, $\log y \equiv \log Y - \log P$. এখন, মনে করি, এই তিনটি চলরাশিই সময়ের (t) অপেক্ষক। উভয়পক্ষকে t-এর সাপেক্ষে অবকলন করে পাই, $\frac{1}{y}\frac{dy}{dt} \equiv \frac{1}{Y}\frac{dY}{dt} - \frac{1}{P}\frac{dP}{dt}$. অর্থাৎ, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ≡ জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার – জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। এখন, যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয়

আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে মাথাপিছু আয় কমে যাবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটা সম্ভব হবে না।

2. মূলধনের স্বল্পতা (Lack of capital) ঃ

অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা হল মূলধনের অভাব। নার্কসের মতে, অনুন্নত দেশে মূলধনের যোগান কম, আবার মূলধনের চাহিদাও কম। মূলধনের চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হতেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। এই দুষ্টচক্র হল এমন কতকগুলো শক্তির একত্র সমাবেশ যারা একে অপরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই একটি অনুন্নত দেশকে অনুন্নতির জালে আবদ্ধ রাখে। এই দুষ্টচক্রের প্রধান কারণ হ'ল মূলধনের স্বল্পতা। এর ফলেই একটি দরিদ্র দেশ দরিদ্রই রয়ে যায়।

3. বাজারের অসম্পূর্ণতা (Market imperfections) ঃ

অনুন্নত দেশে বাজারের নানা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এ সমস্ত দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলো সম্পূর্ণরূপে গতিশীল নয়। বিভিন্ন সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে শ্রমিকেরা দেশের এক অংশ হতে অন্য অংশে বা এক পেশা হতে অন্য পেশায় যেতে চায় না। মূলধনও সম্পূর্ণরূপে গতিশীল নয়। এর ফলে সম্পদের কাম্য ও পূর্ণ ব্যবহার ঘটে না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

4. আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ (International forces) ঃ

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং মূলধন গমনাগমনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো কাজ করে। এই শক্তিগুলো যেমন একদিকে উন্নত দেশগুলোকে আরও অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি অনুন্নত দেশগুলোকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো নিম্নলিখিতভাবে অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুন্নত দেশগুলোকে কৃষিপণ্য রপ্তানিকারী এবং শিল্পদ্রব্য আমদানিকারী দেশ হিসেবে রেখে দিয়েছে।

(খ) বৈদেশিক বাণিজ্য হার কৃষিপণ্যের প্রতিকূলে থেকেছে এবং তা অনুন্নত দেশের স্বার্থহানি ঘটিয়েছে।

(গ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুন্নত দেশে আন্তর্জাতিক প্রদর্শন প্রভাব সৃষ্টি করেছে। Nurkse মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক স্তরে প্রদর্শন প্রভাব কার্যকর হবার ফলে অনুন্নত দেশগুলোর ভোগ্যব্যয় অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি হয়। ফলে এদের সঞ্চয় কমে, মূলধন গঠন কম হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

(ঘ) বিদেশি মূলধন ও বিদেশি কৃৎকৌশলের মাধ্যমে অনুন্নত দেশ থেকে মুনাফা ও রয়াল্টি বাবদ মোটা টাকা বিদেশে চলে যায়। এভাবে অনুন্নত দেশ থেকে সম্পদের নিঃসরণ (drain) ঘটে। উন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলো নানাভাবে অনুন্নত দেশে শোষণ চালায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং তাদের নানাভাবে শোষণ করেছিল। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শোষণের অবসান ঘটলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মূলধন হস্তান্তরের মাধ্যমে পরোক্ষ শোষণ বজায় আছে। এ সমস্ত শোষণই অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা।

5. উপযুক্ত পরিবেশের অভাব (Lack of suitable environment) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। অনুন্নত দেশে প্রায়শই তা থাকে না। তাছাড়া, শিল্পবিপ্লব সার্থক হওয়ার জন্য কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিপ্লব সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন তা অনুন্নত দেশে নেই। ফলে এই দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

6. কৃৎকৌশলগত বাধা (Technological constraints) ঃ

পাশ্চাত্যের কৃৎকৌশল অনুন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নয়। উন্নত দেশগুলোর কৃৎকৌশল শ্রমসঞ্চয়ী ও মূলধন ব্যবহারকারী। কিন্তু অনুন্নত দেশে অদক্ষ শ্রম উদ্বৃত্ত, অথচ সেখানে মূলধনের অভাব। আবার, এখানে দক্ষ শ্রমিকেরও অভাব। এরূপ দেশের পক্ষে উপযুক্ত কৃৎকৌশল এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা উন্নত দেশগুলো থেকে অত্যাধুনিক কৃৎকৌশল আমদানি করে। ফলে একদিকে মূলধন

ও দক্ষ শ্রমিকের প্রচণ্ড চাহিদার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে বহু সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিক বেকার থেকে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য ধরনের কৃৎকৌশল গ্রহণ করার অসুবিধা হ'ল অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটা বড় বাধা।

7. পশ্চাদ্‌গামী প্রভাব (Backwash effect) ঃ

Myrdal-এর মতে, অনুন্নত দেশে সাধারণত একটি দ্বৈত অর্থব্যবস্থা বিরাজ করে। এখানে একটি ক্ষুদ্র অংশ খুবই উন্নত এবং বাকি বৃহৎ অংশ অনুন্নত। এই দুই অংশ পাশাপাশি বিরাজ করে কিন্তু উন্নত অংশ দেশের অনুন্নত অংশকে টেনে উপরে তুলতে পারে না। বরং উন্নত অংশটি অনুন্নত অংশের সম্পদ টেনে নিয়ে নিজে আরো উন্নত হয় এবং অনুন্নত অংশটি ক্রমাগত অনুন্নত হতে থাকে। একেই Myrdal অর্থনৈতিক উন্নয়নের পশ্চাদ্‌গামী প্রভাব (Backwash effect) বলেছেন। এই প্রভাব অনুন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে বলে Myrdal মনে করেন।

8. কৃষি সম্পর্কিত বাধা (Agricultural constraints) ঃ

অধিকাংশ অনুন্নত দেশে কৃষিই প্রধান কার্য হলেও কৃষিক্ষেত্র তেমন উন্নত নয়। এখানে কৃষি উৎপাদন পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল (gamble in monsoons)। ফলে কৃষি উৎপাদন স্থিতিশীল নয়। ফলে কৃষিতে বিনিয়োগ ঘটে না। এজন্য সমগ্র অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া, কৃষকেরা নিরক্ষর, রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী। উন্নত বীজ, সার, কৃষিপদ্ধতি তারা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। ফলে কৃষিতে বিশেষায়ণ ঘটে না, শ্রমের চলনশীলতা ব্যাহত হয়। এসবের ফলে অনুন্নত দেশের কৃষিতে উৎপাদনশীলতা খুবই কম। এটিও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে গেলে অন্তত উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে কৃষি উৎপাদন বাড়াতেই হবে।

9. মানব সম্পদের বাধা (Human resource constraint) ঃ

অনুন্নত দেশের মানব সম্পদও অনুন্নত। এ সমস্ত দেশে জনসংখ্যা খুব বেশি, কিন্তু পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিকের অভাব। শ্রমিকের শিক্ষাদীক্ষার মানও উন্নত নয়। ফলে শ্রমের চলনশীলতা খুবই কম। বৃত্তিগত বিশেষায়ণও বড় একটা ঘটে না। এসবের ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা তথা সমগ্র দেশের প্রসারের হার খুবই কম হয়।

10. অন্যান্য বাধা (Other constraints) ঃ

এই বাধাগুলোর মধ্যে কয়েকটি হল অর্থনৈতিক, কয়েকটি রাজনৈতিক বাধা, আবার কয়েকটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধা। **অর্থনৈতিক অন্যান্য বাধার** মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ (i) ঝুঁকি ও উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ও উপযুক্ত মানের ব্যক্তির অভাব, (ii) দক্ষ পরিচালকের অভাব, (iii) কারিগরি জ্ঞান প্রদানকারী সংস্থার অভাব, (iv) উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, (v) উন্নত ব্যাঙ্ক ও ঋণ ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি।

রাজনৈতিক বাধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ (i) স্থিতিশীল সরকারের অভাব, (ii) জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাব, (iii) জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব, (iv) অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ (i) শিক্ষার অভাব, (ii) জাতিভেদ প্রথা, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি কুসংস্কারের উপস্থিতি, (iii) আত্মতৃপ্তির মনোভাব ও ভাগ্যে বিশ্বাস, (iv) কর্মবিমুখতা, (v) ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় প্রভৃতি।

এসমস্ত বাধার ফলে অনুন্নত দেশগুলো অনুন্নতই রয়ে যায়। উন্নয়ন ঘটাতে গেলে এসমস্ত বাধা দূর করতে হবে। Rosenstein-Rodan বলেছেন, এজন্য চাই এক বিরাট বা জোর ধাক্কা। Leibenstein বলেছেন Critical minimum effort প্রয়োজন। আর Nurkse এবং Lewis বলেছেন, কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রম শিল্পে নিয়োগ করে মূলধন গঠন করা প্রয়োজন।

1.6. অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের আন্তর্জাতিক তুলনা (International Comparisons of Levels of Economic Development):

যে মাপকাঠিতেই পরিমাপ করা হোক না কেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আয়ে তীব্র বৈষম্য দেখা যায়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশগুলোকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করেছে : নিম্ন আয়ের দেশ, মধ্য আয়ের দেশ এবং উচ্চ আয়ের দেশ। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোকে মোটের উপর অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত (বা উন্নয়নশীল) বা অনগ্রসর দেশ বলে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে উচ্চ আয়ের দেশগুলোকে উন্নত বা অগ্রসর দেশ বলে বর্ণনা করা হয়। বিশ্বের দেশগুলোর এই শ্রেণিবিভাগ বিশ্ব ব্যাঙ্ক করে থাকে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে। আমরা জানি যে, মাথাপিছু আয়ই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপের সবচেয়ে জনপ্রিয় সূচক। সুতরাং, বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনা করে আমরা তাদের উন্নয়নের স্তরের একটা তুলনা করতে পারি। নীচের সারণিতে আমরা কয়েকটি দেশের মাথাপিছু আয় দেখিয়েছি। এই আয় ডলারের অঙ্কে 2000 সালের। সারণি থেকে আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বা বৈষম্য রয়েছে। শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের ন্যায় দেশগুলোতে মাথাপিছু আয় খুবই কম (350 মার্কিন ডলার হতে 600 মার্কিন ডলারের মধ্যে)। এরা নিম্ন আয়ের দেশ। আবার, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় দেশগুলোর মাথাপিছু আয় খুবই বেশি। আমাদের সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, 2000 সালে এদের মাথাপিছু আয় ছিল 24,000 ডলারেরও বেশি। আর এই দুই শ্রেণির মাঝে রয়েছে কিছু দেশ যারা প্রথম শ্রেণির মতো এত দরিদ্র নয়, আবার দ্বিতীয় শ্রেণির মতো এতো ধনী নয়। এই শ্রেণিতে রয়েছে ব্রাজিল, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো ও আর্জেন্টিনার ন্যায় দেশগুলো। বিশ্ব ব্যাঙ্কের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী এরা মাঝারি আয়ের দেশ। 2000 সালে এই দেশগুলোর মাথাপিছু আয় ছিল 3000 ও 10,000 মার্কিন ডলারের মধ্যে। এরা মধ্য-আয়ের দেশ। আমরা আগেই বলেছি, নিম্ন ও মধ্যআয়ের দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত দেশ বলা হয়, আর উচ্চ আয়ের দেশগুলোকে উন্নত দেশ বলা হয়।

সারণি

কিছু নির্বাচিত দেশের মাথাপিছু আয় (2000)

ক্রমিক সংখ্যা	দেশ	US ডলারে মাথাপিছু আয় (2000)
1	বাংলাদেশ	380
2	ভারত	460
3	পাকিস্তান	470
4	মালয়েশিয়া	3,380
5	ব্রাজিল	3,570
6	মেক্সিকো	5,080
7	আর্জেন্টিনা	7,040
8	যুক্তরাজ্য (U.K)	24,500
9	ফ্রান্স	24,900
10	জার্মানি	25,050
11	জাপান	34,210
12	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	34,260

সূত্র ঃ বিশ্ব ব্যাঙ্ক, *World Development Report, 2002*

মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন স্তরের এরূপ তুলনা বহুল প্রচলিত হলেও এরূপ তুলনার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। **প্রথমত,** বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয় প্রকাশ করা হয় বিভিন্ন মুদ্রার মাধ্যমে।

বিভিন্ন দেশের মুদ্রা সরাসরি পরস্পরের তুলনীয় নয়। বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়ের মধ্যে তুলনা করতে গেলে ঐসব দেশের জাতীয় আয়কে একই মুদ্রার অঙ্কে প্রকাশ করতে হবে। সেটি করা হয় কোনো দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়কে ঐ দেশের মুদ্রায় বিশেষ দেশের মুদ্রার মূল্য দিয়ে ভাগ করে অর্থাৎ কোনো দেশের মাথাপিছু আয় ÷ সেই দেশের মুদ্রায় নির্দিষ্ট বিশেষ দেশের মুদ্রার মূল্য। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ভারতের মাথাপিছু আয় হল 3600 টাকা। এখন, মনে করি, টাকার অঙ্কে ডলারের মূল্য 45 টাকা। তাহলে ডলারের অঙ্কে ভারতের মাথাপিছু আয় $= \frac{3600}{45} = 80$ ডলার। অবশ্য এই পরিমাপেও কিছু ফাঁক থেকে যায়। এই পরিমাপ যথাযথ হত যদি মুদ্রার বিনিময় হারে প্রকৃত দ্রব্যমূল্যের প্রতিফলন ঘটতো। আমাদের উদাহরণে, টাকাকে ডলারে রূপান্তর যথাযথ বলে গণ্য করা যাবে যদি ভারতে 45 টাকার ক্রয়ক্ষমতা আমেরিকায় 1 ডলারের ক্রয়ক্ষমতার সমান হয়। কিন্তু বাস্তবে তা সাধারণত হয় না। তাই কোনো মুদ্রাকে অন্য মুদ্রার অঙ্কে প্রকাশ করার মধ্যে কিছু ভুল থেকে যায়। ফলে বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের তুলনাতেও কিছু ফাঁক থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় বিভিন্ন দেশ আয়ের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ও পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। যেমন, উদাহরণস্বরূপ, কিছু দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় সেবাকার্যকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। আবার অন্য কিছু দেশে জাতীয় আয় গণনার সময় সেবাকার্যের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বভাবতই, ঐ দু'ধরনের দেশের জাতীয় আয় সরাসরি পরস্পরের তুলনীয় নয়। **তৃতীয়ত,** অনুন্নত দেশে মোট উৎপন্নের একটা বড় অংশ বাজারে বিক্রির জন্য আসে না। ঐ সমস্ত দ্রব্যের যদি কোনো মূল্য না ধরা হয়, তাহলে ঐ সকল দেশের জাতীয় আয়ের মান প্রকৃত জাতীয় আয় অপেক্ষা কম হবে। **চতুর্থত,** আর্থিক জাতীয় আয় হতে প্রকৃত জাতীয় আয় পেতে গেলে আর্থিক জাতীয় আয়কে দাম সূচক দ্বারা ভাগ করতে হয়। তাহলে এই দাম সূচকের নির্বাচনের উপরও প্রকৃত জাতীয় আয়ের মান নির্ভর করবে। কোন্ বছরের দামসূচক গ্রহণ করা হবে তার কোনো বস্তুনিষ্ঠ নিয়ম নেই। সুতরাং, দাম সূচকের নির্বাচন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৃত জাতীয় আয়ের মান ভিন্ন হবে।

এ সমস্ত কারণে বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু আয়ের কোন অর্থবহ তুলনা খুবই জটিল বিষয়। কিন্তু বিকল্প কোন অপেক্ষাকৃত ভাল পদ্ধতি না থাকায় মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতেই বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তরের তুলনা করার রীতি চলে আসছে।

1.7. অর্থনৈতিক প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Economic Growth and Economic Development):

কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসারের মধ্যে পার্থক্য করতে চান। তাঁদের মতে, নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, অর্থনৈতিক প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দুটি ভিন্ন ধারণা। অর্থনৈতিক প্রসার হল মোট জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে দেশের আর্থিক কাঠামোয় পরিবর্তন। এই কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনের পরিবর্তন। প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে অর্জিত আয়ের অনুপাত কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও তৃতীয় ক্ষেত্রের আয়ের অনুপাত বাড়তে থাকে। তেমনি, জনসাধারণের জীবিকার কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটে। এসমস্ত পরিবর্তন না ঘটলে তাকে বলা হবে অর্থনৈতিক প্রসার। আর জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে এই কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলা হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। যেমন, Kindleberger-এর মতে, অর্থনৈতিক প্রসারের অর্থ হল বর্ধিত উৎপাদন, আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ হল বর্ধিত উৎপাদনের পাশাপাশি ঐ উৎপাদনের কলাকৌশল ও বণ্টনের পরিবর্তন।

অবশ্য Lewis অর্থনৈতিক প্রসার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথা দু'টি একই অর্থে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। তাঁর "The Theory of Economic Growth" বইয়ে তিনি বলেছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোঝাতে

আমরা 'Growth' কথাটি ব্যবহার করবো ; তবে **বৈচিত্র্যের জন্য কিংবা একঘেয়েমি কাটাতে** মাঝে মাঝে 'Progress' অথবা 'Development' কথাটি ব্যবহার করা হবে।

কিন্তু Friedman মনে করেন যে, অর্থনৈতিক প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথা দুটির তাৎপর্য আলাদা। তাঁর মতে, প্রসার হল কোন কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়াই অর্থনীতির এক বা একাধিক দিকে বিস্তার। কিন্তু উন্নয়ন হ'ল, তাঁর কথায়, একটি উদ্ভাবনমূলক প্রক্রিয়া যার ফলে সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোগত রূপান্তর ঘটে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল ব্যাপকতর শব্দ। অর্থনৈতিক প্রসার হল মাথাপিছু উৎপন্নের পরিমাণগত পরিবর্তন। এরই পাশাপাশি ঘটে শ্রমশক্তি, ভোগ, মূলধন ও বাণিজ্যের বিস্তার। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে শুধু এই সকল পরিমাণগত পরিবর্তনকেই বোঝায় না, এরই সাথে মানুষের অভাব, অনুপ্রেরণা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক রীতিনীতির গুণগত পরিবর্তনকেও বোঝায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে প্রসার ও সঙ্কোচন (decline) উভয়কেই বোঝায়। কোনো অর্থনীতিতে প্রসার ঘটছে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে না তাও হতে পারে। কেননা এমন হতে পারে যে, অর্থনৈতিক প্রসারের সাথে সাথে উপযুক্ত কাঠামোগত ও প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন না ঘটার ফলে দারিদ্র্য, বেকারি ও অসাম্য বাড়ছে। সুতরাং কোন দেশে অর্থনৈতিক প্রসার ঘটছে কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে না এমনটা হতেই পারে। উদাহরণস্বরূপ আমরা অধ্যাপক Clower কর্তৃক লাইবেরিয়ার অর্থনীতির সমীক্ষা উল্লেখ করতে পারি। Clower এই সমীক্ষার ফলাফলের যে শিরোনাম দিয়েছিলেন তা খুবই অর্থবহ। শিরোনামটি হল ঃ উন্নয়নহীন প্রসার (Growth without Development)। উন্নয়ন ছাড়াই প্রসার ঘটতে পারে। তবে এর উল্টোটি সত্য নয়। কেননা প্রসার ছাড়া উন্নয়ন ঘটতে পারে না।

উপসংহারে বলতে পারি, অর্থনৈতিক প্রসার বলতে বোঝায় প্রকৃত আয়ে বৃদ্ধি। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে আমরা শুধু এই আয়বৃদ্ধির সূচককেই বুঝি না, পাশাপাশি অন্যান্য সূচক, যেমন, আয়ের বণ্টন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিসেবা, আবাসন, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সূচকের কাম্য দিকে পরিবর্তন বুঝি। অর্থনৈতিক প্রসারের অর্থ হল উৎপাদনের বৃদ্ধি, আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ হল অর্থনৈতিক প্রসার ও পরিবর্তন (Growth plus change)। এই পরিবর্তন দেশের সামগ্রিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে এমন যে কোনো পরিবর্তন হতে পারে। তবে এর মধ্যে দেশের কাঠামোগত পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টতই, অর্থনৈতিক প্রসার কথাটি স্বল্পকালে প্রযোজ্য, কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া কেননা কোনো দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন দীর্ঘকালেই সম্ভব। আবার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে অর্থনৈতিক প্রসার অবশ্যই ঘটবে কিন্তু অর্থনৈতিক প্রসার ঘটলে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবেই তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

অবশ্য অনেক অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসারের মধ্যে এই সীমারেখা টানেন না। আমাদের আলোচনায়ও আমরা এই দুটি ধারণার মধ্যে কোন পার্থক্য করছি না। আমরা এই দুটিকে সমার্থক বলে ধরছি। অর্থনৈতিক প্রসার ছাড়া যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক প্রসারের কোন মূল্য নেই। সুতরাং, এই দুটি ধারণা যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সেজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রসারকে আমরা সমার্থক হিসেবেই দেখছি। যখন অর্থনৈতিক প্রসার ঘটছে তখন অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঘটছে বলে আমরা ধরে নিচ্ছি। আর যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে, তখন অর্থনৈতিক প্রসার তো ঘটছেই কেননা অর্থনৈতিক প্রসার ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

1.8. উন্নয়ন অর্থনীতির বিকল্প তত্ত্বসমূহ (Alternative Approaches to Development Economics) :

উন্নয়নমূলক অর্থনীতির আলোচনায় মূলত দুটি ধারা বা দুটি দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান ঃ চিরাচরিত বা নয়া-প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি এবং মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

1. চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি বা চিরাচরিত তত্ত্ব (Traditional or Neoclassical Approach):

চিরাচরিত তত্ত্বে বলা হয় যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উন্নয়নের স্তরের তারতম্যের প্রধান কারণ হল তাদের

প্রাকৃতিক সম্পদের তারতম্য। এ ধরনের অর্থনৈতিক তত্ত্বের মধ্যে রয়েছে Nurkse-এর দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র, Nelson-এর নিম্ন আয়ের ভারসাম্য ফাঁদ, Leibenstein-এর একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন প্রচেষ্টার তত্ত্ব, Myrdal-এর ক্রমপুঞ্জিত কার্যকারণ তত্ত্ব প্রভৃতি।

2. মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Marxian Approach) ঃ

মার্ক্সীয় তত্ত্বে বা মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় যে, অনুন্নতি ও উন্নতি পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত। উন্নয়নের পূর্বে পৃথিবীতে কোন অনুন্নতি ছিল না। উন্নয়নের ন্যায় অনুন্নতিও একটি প্রক্রিয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলস্বরূপ উন্নতি ও অনুন্নতির উন্মেষ ঘটেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বর্তমানে অনুন্নত দেশগুলো আসলে উন্নত দেশগুলোর ঔপনিবেশিক শোষণের জন্যই অনুন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন Baran, Frank, Kay, Immanuel এবং আরও অনেকে।

আবার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বগুলোকে অনেকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (i) ফাঁদ সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ (Trap Theories), (ii) প্রাচীন তত্ত্বসমূহ (Classical Theories) এবং (iii) মার্ক্সীয় তত্ত্বসমূহ (Marxian Theories)

(i) ফাঁদ সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহ (Trap Theories) ঃ

এই ধরনের তত্ত্বের আওতায় সেই তত্ত্বগুলোকে রাখা হচ্ছে যেগুলো মূলত ম্যালথুসীয় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আয়বৃদ্ধির মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখানো। এই ধরনের তত্ত্বের প্রবক্তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি জোর ধাক্কা বা একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন প্রচেষ্টার কথা বলেন। Rodan-এর জোর ধাক্কার তত্ত্ব, Leibenstein-এর একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন প্রচেষ্টার তত্ত্ব এবং Nelson-এর নিম্ন আয়স্তরের ভারসাম্যের ফাঁদ তত্ত্ব এই শ্রেণির উন্নয়ন তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া, উন্নয়ন তত্ত্বসমূহের এই ধরনের শ্রেণিবিভাগের সমর্থকদের মতে, সুষম ও অসম উন্নয়ন তত্ত্বের বিভিন্ন ভাষ্য এবং Rostow-র উত্তোলন তত্ত্বও (Take off theory) এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই সকল তত্ত্বের প্রবক্তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলত জোর ধাক্কার বা একযোগে বৃহৎ পরিমাণ বিনিয়োগের কথা বলেছেন, যদিও এই জোর ধাক্কার ধারণা এবং তার যৌক্তিকতা সবার তত্ত্বে একরকম নয়। কিন্তু এসকল তত্ত্বগুলো নির্দেশ করে যে, যদি কোন দেশ পর্যাপ্ত আকারের বড় পরিমাণ বিনিয়োগ একযোগে বা এক লপ্তে করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেই দেশ অনুন্নতই থেকে যায়। সেই দেশ অনুন্নতির শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না।

(ii) প্রাচীন তত্ত্বসমূহ (Classical Theories) ঃ

এই শ্রেণিতে সেই সমস্ত তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেগুলো উদ্বৃত্ত আহরণের প্রক্রিয়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আয় প্রসারের মধ্যে সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলোচনা করে। রিকার্ডোর উন্নয়ন মডেল, লুইসের অসীম শ্রমের যোগানের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল এবং নার্কসের প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ও সুপ্ত সঞ্চয়ের মডেল এই প্রাচীন তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

(iii) মার্ক্সীয় তত্ত্বসমূহ (Marxian Theories) ঃ

আমরা আগেই বলেছি যে, এই তত্ত্বে অনুন্নতির কারণ হিসেবে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের প্রসারকেই দায়ী করা হয়। এই তত্ত্বের মূলকথা হল যে, উপনিবেশকারীরা তাদের উপনিবেশগুলোকে শোষণ করে, তাদের কাঁচামাল সস্তায় আত্মসাৎ করে এবং পুনরায় ঐ উপনিবেশে শিল্পজাত দ্রব্য বেশি দামে বিক্রি করে। এভাবে তারা উপনিবেশগুলোর সম্পদ আহরণ করেছে, উপনিবেশগুলোকে তাদের নিজস্ব সম্পদ হতে বঞ্চিত করেছে এবং সেই সম্পদের দ্বারা তারা নিজেরা উন্নত হয়েছে। সুতরাং উপনিবেশবাদই হল একাধারে উন্নতি ও অনুন্নতির ফল।

লক্ষণীয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বসমূহের এই শ্রেণিবিভাগ পূর্ণাঙ্গ নয় এবং কিছু তত্ত্বকে একাধিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা চলে। যেমন, প্রাচীন তত্ত্বের একটা অংশ হল ম্যালথুসীয় তত্ত্ব। কিন্তু এখানে ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বকে ম্যালথাসের তত্ত্ব হতে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। ম্যালথাসের তত্ত্বে আয় ও জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রক্রিয়া দেখানো হয়। কিন্তু প্রাচীন তত্ত্বে উদ্বৃত্ত সম্পদের আহরণ প্রক্রিয়া এবং তার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার, মার্ক্সকে অনেক সময় ক্ল্যাসিকাল বা প্রাচীন ধনবিজ্ঞানী বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মার্ক্সের অনুন্নতি সম্পর্কে যে ঔপনিবেশিক শোষণের তত্ত্ব তা কখনোই ক্ল্যাসিকালধর্মী নয়। কারণ, এই তত্ত্বে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই একটি দেশ অপর দেশকে শোষণ করছে, বৈদেশিক বাণিজ্য এখানে শোষণের বাহন (vehicle)। কিন্তু প্রাচীনতত্ত্বে বৈদেশিক বাণিজ্যকে উন্নয়নের ইঞ্জিন বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং, অনুন্নতির ব্যাখ্যা হিসেবে ঔপনিবেশিক শোষণের তত্ত্ব কখনোই চরিত্রগতভাবে ক্ল্যাসিকাল নয়। শোষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে তা মার্ক্সীয় তত্ত্ব বলে অভিহিত হতে পারে ; কিন্তু তা ক্ল্যাসিকাল বা প্রাচীন তত্ত্ব নয়।

1.9. আধুনিক অর্থনৈতিক প্রসারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ কুজনেৎস্-এর আলোচনা (Characteristics of Modern Economic Growth) :

Simon Kuznets তাঁর *Modern Economic Growth* (1966) বইয়ে অর্থনৈতিক প্রসারের (Economic growth) একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক প্রসার হল মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের অনবরত (sustained) বা নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধি। এর সাথে সাথে জনসংখ্যাও প্রায়শই বাড়ে এবং সাধারণত গভীর কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। (Economic growth is a sustained rise in per capita real income, most often accompanied by a rise in population and usually by sweeping structural changes). এই সংজ্ঞা কয়েকটি মৌল বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। **প্রথমত,** অর্থনৈতিক প্রসারের জন্য প্রকৃত আয় বা উৎপাদনের ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রয়োজন। **দ্বিতীয়ত,** অর্থনৈতিক প্রসারের সাথে সাথে সাধারণত কিছু কাঠামোগত পরিবর্তনও ঘটে থাকে। এই কাঠামোগত পরিবর্তনের অর্থ হল, অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রাধান্য কৃষি হতে শিল্পে এবং অবশেষে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থানান্তরিত হওয়া। পেশাগত কাঠামোতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। **তৃতীয়ত,** শ্রমিক সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। আধুনিক অর্থনৈতিক প্রসার বলতে কুজনেৎস্ পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশগুলো, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং কিছু উন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, আধুনিক অর্থনৈতিক প্রসার বলতে একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক যুগসময়কে বোঝায় (Modern economic growth marks a distinct economic epoch)। কুজনেৎস্-এর মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হতে এই যুগের শুরু। আমাদের এই আলোচনায় আধুনিক অর্থনৈতিক প্রসারের সময়কাল হ'ল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ বা ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হতে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে এই সময়কালের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে তাকেই সাইমন কুজনেৎস্ **আধুনিক অর্থনৈতিক প্রসার** (Modern economic growth) বলে অভিহিত করেছেন।

অধ্যাপক কুজনেৎস্ আধুনিক অর্থনৈতিক প্রসারের ছয়টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো জাতীয় উৎপাদন ও তার উপাদান, জনসংখ্যা, শ্রমিক, জনসংখ্যার পেশা প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত। কুজনেৎস্ আধুনিক অর্থনৈতিক প্রসারের যে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে দুটির চরিত্র পরিমাণগত—এই দুটি বৈশিষ্ট্য জাতীয় উৎপাদন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। দুটি বৈশিষ্ট্য দেশের কাঠামোগত পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত এবং বাকি দুটি বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক বা বাহ্যিক প্রসারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমরা **আধুনিক অর্থনৈতিক প্রসারের এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য** একে একে আলোচনা করবো।